বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ
পাকিস্তান
থেকে পালিয়ে আসার
ভয়ঙ্কর দিনগুলি
এম. এ. শোয়েব

এম. এ. শোয়েব: জন্ম ১ জুন। পাঁচ ভাই এক বোনের মধ্যে তিনি তৃতীয়। বাবা ছিলেন টেলিফোন এন্ড টেলিগ্রাফ (টি এন্ড টি) -এর ইঞ্জিনিয়ার। তার মা তাদের অনেক ছোট রেখেই পরলোক গমন করেন। দ্বিতীয় মা আপন মায়ের মতোই আদর স্নেহ দিয়ে তাদের মানুষ করেছেন। বাবার চাকরি-সূত্রে তখন তারা পশ্চিম পাকিস্তানের করাচীতে। দ্বিতীয় মা করাচীতে ইন্তেকাল করার পরই তার বাবা সিদ্ধান্ত নেন পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসার। পিতার নানা সীমাবদ্ধতার কথা বুঝে অতঃপর সদ্য তরুণ শোয়েব নিজেই সিদ্ধান্ত নেন যেকোনো উপায়ে হোক একাই স্বদেশে ফিরে আসবেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ১৯৭৩ সালে তিনি স্বদেশের উদ্দেশ্যে বের হন এবং সফলকাম হন।

এম. এ. শোয়েব পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন ঢাকাতে। করাচীতে গিয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে S.S.C. পাশ করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশে এসে সোজা দেশের বাড়ি বরিশাল গৌরনদীতে চলে যান এবং সেখানে সরকারী গৌরনদী কলেজে ভর্তি হন। গৌরনদী কলেজ থেকে H.S.C. পাশ করেন। তারপর বাবা ১৯৭৪ সনে বাংলাদেশ পাকিস্তান বন্দী-বিনিময় চুক্তির মাধ্যমে ঢাকায় আসেন। তখন শোয়েব বরিশাল হতে ঢাকায় চলে আসেন এবং জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন। একই সময়ে তিনি ছায়ানট সংগীত বিদ্যালয়েও ভর্তি হন। ছায়ানট-এর কোর্স শেষ হবার আগেই ঢাকা হতে তার একটি একক বাংলা গানের এ্যালবাম বের হয় ডিসকো রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে ১৯৮১ সনে। এটিকে বাংলাদেশের প্রথম অডিও এ্যালবাম বলে ধরা হয়। ১০টি গান নিয়ে ক্যাসেটের মাধ্যমে প্রকাশ পায় এ্যালবামটি। এক পরিসংখ্যানে বলা হয়, এ যাবত এই এ্যালবামটি ৩৮ লক্ষ কপি বিক্রয় হয়েছে। সে-সময় বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ক্যাসেটটি পৌঁছে যায়। সেই থেকে তাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। রেডিও, টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্রে সুযোগ পান গান করার জন্য। গানকে তখন তিনি পেশা হিসেবে নেন। ১৯৮৪ সনে তিনি বিয়ে করেন। ১৯৮৮ সনে আমেরিকার লস্‌এঞ্জেলেসে চলে যান। এক ছেলে সাইফ, এক মেয়ে শারলিন এবং স্ত্রী মিনাকে নিয়ে তার ছোট একটি পরিবার। সবাইকে নিয়ে এখন তিনি আমেরিকার এ্যারিজোনাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। বর্তমানে ব্যবসার পাশাপাশি তিনি বাংলা সংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে আছেন।

প্রচ্ছদ : তাজুল ইমাম

বাবার বদলি চাকরি সূত্রে পঞ্চম শ্রেণি পড়ুয়া এক কিশোর পরিবারের সাথে পাড়ি দেন ঢাকা থেকে করাচী। এক নতুন ভূগোল, নতুন সংস্কৃতি, নতুন ভাষা তাকে শিহরিত করে, কৌতূহলী করে। কিন্তু সংগীতপ্রেমি কিশোর তখন থেকেই রেডিওতে গান শুনে শুনে তা আয়ত্ত্ব করে বন্ধু-পরিজনদেরকে সেই গান শোনান। তারপর শুরু হয় বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম। শত্রুপরিবেষ্টিত অবস্থায়ই জন্মভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি তার হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে। কিন্তু তখন তারা নিরুপায়। অবশেষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর বন্দী-বিনিময় চুক্তি সম্পাদনের আগে ১৯৭৩ সালে সদ্য এক তরুণ প্রথমে করাচী থেকে সিন্ধু প্রদেশের চামান সীমান্ত হয়ে আফগানিস্তানের কান্দাহার, তারপর কাবুল, কাবুল থেকে দিল্লী, দিল্লী থেকে কোলকাতা, কোলকাতা থেকে শিয়ালদহ; তারপর বেনাপোল হয়ে যশোর, যশোর থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করে। যাত্রাপথের নানান লোমহর্ষক এবং হৃদয়গ্রাহী ঘটনা এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের নানা মাত্রিক ঘটনার এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে নিঃসন্দেহে বিবেচিত হবে এম. এ. শোয়েবের এই স্মৃতিচারণ গ্রন্থটি।

ISBN 978 984 04 1771 1

উৎসর্গ

মিনা শোয়েব
আমার প্রিয়তমা পত্নী

আমার কিছু কথা

যতদূর মনে পড়ে আমার বোধ হবার পর থেকে সুর, ছন্দ, গান, কবিতা, গল্প ছবি আঁকা আমাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করত। বয়স বাড়ার সাথে সাথে লেখাপড়ার পাশাপাশি এই বিষয়গুলো আমাকে পেয়ে বসল। সারা দিনরাত সময় পেলেই গল্পের বই, কবিতার বই পড়া। আর রেডিওতে গান শোনা। সখের বসেই তাই বাসায় একটা বইয়ের লাইব্রেরি করলাম। সবার সাথে বই বিনিময় করতাম। কুয়াশা, মাসুদ রানা, দস্যু বাহারাম, দস্যু মোহন, নিহাররঞ্জন গুপ্তের বই, কিছু শরৎচন্দ্র, সমরেশ বসু এবং রবীন্দ্রনাথের বইও ছিল।

স্কুলে টিফিনের ফাঁকে যখন সবাই খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত, আমি তখন ক্লাসরুমে কিছু সঙ্গীতপ্রেমী বন্ধুদের নিয়ে গানের আসর জমিয়ে দিতাম। এক সময় আমি নিজেই কুয়াশার মতো রহস্যময় একটা সিরিজ গল্পের বই লেখা শুরু করলাম। নাম দিয়েছিলাম দস্যু রবিন। প্রায় ১৫টা সিরিজ লিখে ক্লাসমেট এবং অন্য বন্ধুদের পড়তে দিতাম। যেহেতু বাবার বদলির কারণে আমরা তখন ততকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে, রেডিওতে বাংলার চেয়ে উর্দু গানই বেশি প্রচার করা হত। তাই প্রচুর উর্দু গান শিখে ফেলেছিলাম। মেহেদি হাসান, আহমেদ রুশদি, মাসুদ রানা, মুজিব আলম, বশির আহামেদ এই সব শিল্পীর গান করতাম। আমার কাজই ছিল অবসর সময়ে বন্ধুদের গান শোনানো। বন্ধুরাও আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। বন্ধুদের অনুপ্রেরণা আমাকে গান গাওয়ার সাহস যোগাত। আমার বাবা মা কখনোই আমাকে গানের বিষয়ে সমর্থন দিতেন না।

বাবা বলতেন, ওইসব বাজে কাজ। তার চেয়ে লেখাপড়ায় মন দাও। তবে আমার সব শখকে পিছে ফেলে গানই আমাকে বশীভূত করে ফেলেছিল। গান গাওয়ার সাথে সাথে গান লেখা এবং তাতে নিজের পছন্দমতো সুর করা আমার একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই জীবনে যত মৌলিক গান গেয়েছি তার প্রায় ৭০ শতাংশ গানই আমার লেখা ও সুর করা। গল্প-কবিতা লেখার ইচ্ছা আমার কখনও বিলুপ্ত হয়নি। শুধু সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। তাই পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসার পর থেকে মনটা ব্যাকুল হয়ে ছিল কিভাবে বাংলাদেশ বেতারে ঢোকা যায়। করাচিতে বসে আমি প্রায় ১০০টার মতো বাংলা গান লিখেছিলাম।

সেগুলো আমি সাথে করে নিয়ে এসেছিলাম। আমার বড় ভাইয়ের এক বন্ধু রেডিওতে চাকরি করতেন। তাকে ধরলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি করতে চাও রেডিওতে? আমি বললাম, এই গানগুলো রেডিওতে দিতে চাই। তিনি বললেন, আচ্ছা তুমি এর ভিতর থেকে ২৫টা গান বেছে রেডিওতে নিয়ে আসো। সেখানে আমার পরিচিত জনাব আব্দুল হাই আল হাদি সাহেব আছেন (গীতিকার)। বর্তমানে প্রয়াত।

তারই দায়িত্বে এইসব রয়েছে। আমি তাকে বলে দেব, আশা করি কোনো অসুবিধা হবে না। তার কথামতো ২৫টা গান নিয়ে শাহবাগ রেডিওতে হাজির হলাম। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর আমার ডাক এল রেডিও থেকে। গানগুলি নিয়ে গেলাম জনাব আব্দুল হাই আল হাদির নিকট। তিনি বললেন, গানগুলো রেখে যান। আমি দেখে পরে আপনাকে জানাব। কিছুদিন পরে তিনি জানালেন, এইগুলো নাকি গানের জাতই হয় নাই। কি আর করা। গানগুলো নিয়ে ফিরে এলাম। পরে এই গানগুলোই আমাকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তুলে দিয়েছিল। যাইহোক, কিছুদিন ধরেই আমি ভাবছিলাম, পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসার যে লোমহর্ষক দিনগুলি এবং সময়গুলি আমার জীবনে এসেছে তা যদি লিপিবদ্ধ করে রাখা যায় তবে সেই কষ্টের কিছুটা হলেও লাঘব হত। কিছু লোকের হয়তো সমবেদনা পেতাম। শুধু আমি নই, আমার মতো আরও অনেক বাঙালি আছেন যারা এভাবেই পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছেন। তারা এই বইটি পড়লে হয়তো কিছুটা কষ্ট তাদেরও লাঘব হবে। আমি এই বইতে যা লিখেছি তার তিল পরিমাণও অতিরঞ্জিত করা হয়নি। চোখে যা দেখেছি, গায়ে যা সয়েছি, কানে যা শুনেছি তা থেকেই লেখার চেষ্টা করেছি। আমি আসলে লেখক নই। নিতান্তই শখের বশে লিখেছি। তাই গুণীজনের নিকট অনুরোধ রইল, ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন। এই বই প্রকাশে বিভিন্ন জন সহযোগিতা দিয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাহবুব রেজা রহিম, তাজুল ইমাম, সুকান্ত গুপ্ত অলক, ফাহমিদা রহমান, সৈয়দ মুস্তাফিজুর রহমান। প্রকাশক ওসমান গনি বইটি প্রকাশে সানন্দ আগ্রহ দেখিয়েছেন। সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা।

এম. এ. শোয়েব
e-mail : Shoebaz@hotmail.com

১৯৬৭ সাল। আমরা তখন ঢাকার নাজিমুদ্দিন রোডে থাকি।

বাবা একদিন অফিস থেকে এসে মাকে ডেকে বললেন, আমার বদলি হয়ে গিয়েছে।

মা বিরক্ত হয়ে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, আবার বদলি। তিন বছরও তো শেষ হল না। এরি মধ্যে।

বাবা বললেন, কি আর করব, সরকারি চাকরি।

এবার আবার কোন গ্রামে বদলি হল, ভালো স্কুল পাব তো? মা বললেন।

এবার গ্রামট্রাম নয়, সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে!

তার মানে এটা আবার কোথায়! মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে। বাবা বললেন।

মা এবার উত্তেজিত হয়ে বললেন, কি বলছ!

ঠিকই বলছি, সব গোছগাছ করে নাও। আগামী মাসেই যেতে হবে, বাবা বললেন।

তাহলে তো যখন তখন ঢাকা আসতে যেতে পারব না। মা উদ্বিগ্ন।

বছরে একবার আসবে। বাবা বললেন।

মায়ের মনটা খারাপ হয়ে গেল। কি ভেবে মা বাবাকে বললেন, কোনোভাবেই কি বদলানো যায় না?

আরে না, সব পেপারস সাইন করে দিয়েছি। আজকালকের মধ্যে সেগুলো করাচি চলে যাবে।

মা আর কিছু না বলে চুপচাপ মন খারাপ করে রান্নাঘরে চলে গেলেন।

বাবার এই খবরটা শুনে আমি কিন্তু ভীষণ খুশি হয়েছি, আমার অন্য ভাইয়েরাও দারুণ খুশি হয়েছে। কারণ এই প্রথমবারের মতো আমরা প্লেনে চড়ব। তাও আবার বিশাল বড় প্লেন, Boeing 707.

আমি তখন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি। দিন গুনতে লাগলাম আর আকাশ থেকে প্লেন উড়ে গেলেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকতাম আর ভাবতাম, ক'দিন

পরেই তো আমিও ওই প্লেনের ভিতর থাকব। সবার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাব। স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের সাথে এই নিয়ে গল্প জুড়ে দিতাম। বন্ধুরা বলত, তুই কত ভাগ্যবান, আমাদের ভাগ্যে কি কোনোদিন প্লেনে চড়া হবে। আমি তখন আসলেই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতাম।

বাবা বাসার সব ফার্নিচার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যাদের যা প্রয়োজন বিলিয়ে দিলেন।

অবশেষে এসে গেল সেই দিন। সবার কাছে বিদায় নিয়ে আমরা এসে পৌঁছালাম ঢাকা কুর্মিটোলা বিমান বন্দরে। মামা খালা চাচা চাচি অনেকেই এসেছিল বিমান বন্দরে আমাদের বিদায় জানাতে। সবাইকে বিদায় জানিয়ে আমরা PIA-এর Boeing 707-এ গিয়ে উঠলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্লেন ঢাকার মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ে গেল। তখন সেকি আনন্দ আমার। প্লেনের জানালা দিয়ে দেখতে লাগলাম কিভাবে প্লেনটা পাখির মতো আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে আর ঢাকা শহর ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। বাড়িঘর গাড়িঘোড়া মানুষজন ছোট হতে হতে নিমিষেই অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা মেঘের রাজ্যে হারিয়ে গেলাম। আড়াই ঘণ্টা লেগেছিল আমাদের করাচি বিমান বন্দরে পৌঁছাতে।

ঢাকা বিমান বন্দরের তুলনায় করাচি বিমান বন্দর অনেক বড় এবং আধুনিক। করাচির রাস্তাঘাট বাড়িঘর শপিং মল ঢাকার তুলনায় অনেক বেশি আধুনিক। তাতেই বুঝতে পেরেছিলাম একই দেশে বসবাস করেও পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ কত অবহেলিত।

যাইহোক, বাবা সরকারি কর্মচারী হওয়ায় একটা সরকারি বাসা পেলেন লরেন্স রোডে পাকিস্তান কোয়ার্টার নামে একটি সরকারি কলোনিতে। সেই কলোনিতে আরও অনেক বাঙালি পরিবার ছিল। তাদের সাথে অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের পরিচয় হয়ে গেল। পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব। প্রথম কিছুদিন আমাদের সামান্য অসুবিধা হল। নতুন জায়গায় এলে সাধারণত যা হয়। আমাদের দেশে তো আমরা একটাই জাত, সেটা হল বাঙালি জাত। একটাই ভাষা বাংলা ভাষা। আর এখানে বিভিন্ন জাত, বিভিন্ন ভাষা। বিহারি, পাঞ্জাবি তো আছেই, তারপরে আরও আছে সিন্ধি, পাঠান, মাক্রানি। সিন্ধিরা অনেকটা বাঙালিদের মতোই শান্ত নিরীহ প্রকৃতির। শরীর স্বাস্থ্য অনেকটা বাঙালির মতোই। পাঠানরা লম্বা চওড়া শক্তিশালী কর্মঠ। কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি অন্যদের তুলনায় একটু কম। মাক্রানিরা হল আফ্রিকান কালোদের মতো। এরাও অনেক শক্তিশালী লেখা পড়া কম করে। সবারই

ভাষা আলাদা। তবে উর্দু ভাষা সবারই কমবেশি জানা আছে। এই কারণে আমাদেরও একটু সুবিধা হয়েছিল।

তার কারণ হল, আমরা যে মাতৃগর্ভে জন্ম নিয়েছিলাম সেই মা আমাদের অনেক ছোট রেখেই না ফেরার দেশে চলে গিয়েছিলেন। আমার বাবা আমাদের পাঁচ ভাইকে নিয়ে একটি বছর অনেক কষ্ট করেছেন। কারণ আমরা ছিলাম অনেক ছোট। সবার ছোট ভাইয়ের বয়স ছিল মাত্র ১৮ মাস। আর সবার বড় ভাইয়ের বয়স ছিল ৯ বছর। আমার বয়স ছিল মাত্র ৫ বছর। বাবার খুব কাছের এক বন্ধু বাবাকে বুঝিয়েসুজিয়ে পুরনো ঢাকার আরমানিটোলায় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে দ্বিতীয় বিয়ে করিয়ে দেন। নতুন মামা বাড়ি গিয়ে দেখি মামা খালারা সবাই উর্দু কথা বলে। আমার নতুন মাও উর্দু কথা বলেন। মজার কথা হল এই উর্দু সেই উর্দু নয়। এই উর্দু অনেকটা বাংলা মিশ্রিত। তাই আমাদের শিখতে তেমন বেগ পেতে হয়নি। যাইহোক, এবার এল স্কুলে ভর্তি হবার পালা। করাচিতে একটিই সরকারি বাংলা স্কুল ছিল যার নাম Govt. Secondary School for Bengali Boys.

এই বাংলা স্কুলটি করাচির ভালো স্কুলের মধ্যে একটি ছিল। প্রতি বছরই পাঞ্জাব বোর্ড থেকে এই স্কুলের একাধিক ছাত্রছাত্রী স্ট্যান্ড করত। সুতরাং ভালো স্টুডেন্ট না হলে এই স্কুলে ভর্তি হওয়া ছিল দুরূহ ব্যাপার। বাবা আমাকে নিয়ে গেলেন সেই স্কুলে ভর্তি করতে, যদিও বাবা জানতেন তার ছেলের লেখাপড়ার চেয়ে গান বাজনার প্রতি আগ্রহ বেশি।

আমারও একটু ভয় ভয় করছিল এই ভেবে যে ভর্তি হতে হলে তো ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে! যাইহোক, ভর্তি পরীক্ষা দিলাম এবং কৃতিত্বের সাথে ফেল করলাম। বাবা রেগেমেগে বললেন, জীবনে তুই কিচ্ছু করতে পারবি না, ফালতু গান-বাজনা করে যাত্রা দলে ভর্তি হতে পারবি। আমি ভীষণ কষ্ট পেলাম বাবার কথায়। বাবা হয়তো ঠিকই বলেছেন, জীবনে কিছুই করতে পারব না। বাবা আর আমি শিক্ষকদের কমন রুমে বসে ছিলাম। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অপেক্ষায়। শুনেছি প্রধান শিক্ষক নাকি ভীষণ গুরুগম্ভীর প্রকৃতির। ছাত্রছাত্রী তো বটেই, স্কুলের শিক্ষকরাও নাকি তাকে বাঘের মতো ভয় পায়। অবশেষে প্রধান শিক্ষক জনাব তালুকদার স্যার কমন রুমে এসে হাজির হলেন। কমন রুমে অবস্থানরত সব শিক্ষক উঠে দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান জানালেন। আমি আর বাবাও উঠে দাঁড়ালাম।

তালুকদার স্যার সবার দিকে একবার তাকিয়ে হাতের ইশারায় সবাইকে বসতে বললেন। তারপর বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি

দুঃখিত, আপনার ছেলেকে ভর্তি করতে পারলাম না! নেক্সট টাইম ছেলেকে ভালো প্রিপারেশন করিয়ে নিয়ে আসবেন। সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমাদের শিক্ষকরা রয়েছেন। তারা আপনার ছেলেকে সাহায্য করতে পারেন। এই বলে তিনি কমন রুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। আমরাও উঠে দাঁড়ালাম চলে যাবার জন্য। বাবার বিষণ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে আমার ক্ষোভে লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল। এমন সময় দেখলাম, কমন রুমের দরজা পর্যন্ত গিয়ে প্রধান শিক্ষক তালুকদার স্যার কি মনে করে ঘুরে দাঁড়ালেন। বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, বাই দা ওয়ে, আপনার ছেলের কি কোনো এক্সট্রা ট্যালেন্ট আছে যেমন, ভালো ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল বা বাস্কেটবল খেলতে পারে অথবা অন্য কোনো ট্যালেন্ট, বাবা বললেন, আমার তো তেমন কিছুই জানা নেই। কিন্তু আমার মাথায় যেন হঠাৎ করে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল! আমি প্রায় উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলাম, আমি পারি স্যার!

আমার বলার স্টাইল শুনে কমন রুমের অন্য শিক্ষকরা একটু মুচকি হেসে ফেললেন। কিন্তু তালুকদার স্যার মোটেই হাসলেন না। তিনি গম্ভীর কণ্ঠেই বললেন, কি পার তুমি!

গান গাইতে পারি স্যার! আমি একটু উত্তেজিত হয়ে বললাম।

বেশ তো, গাও দেখি শুনি। তালুকদার স্যার বললেন।

আমি আর কাল বিলম্ব না করে কারো দিকে না তাকিয়ে উদার কণ্ঠে গাইতে শুরু করলাম।

'আমি রূপ নগরের রাজকন্যা রূপের যাদু এনেছি। ইরান তুরান পার হয়ে আজ তোমার দেশে এসেছি।'

তালুকদার স্যার এবার একটু সাবলীল কণ্ঠে বললেন, আরেকটি গাইতে পারবে ?

জী স্যার, পারব।

আচ্ছা তবে গাও।

আমি আবার শুরু করলাম, দুয়ারে আইসাছে পালকি নায়রি গাও তোল রে তোল মুখে আল্লা রসুল সবে বল।

এবার আমি গাইছিলাম আর আড় চোখে দেখছিলাম সব স্যারদের চোখমুখের প্রতিক্রিয়া। দেখে মনে হল সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে গান শুনছে আর মাথা নাড়ছে। অর্ধেক গান শেষ হতেই তালুকদার স্যার হাত

নেড়ে থামতে বললেন। তারপর কমন রুমের শিক্ষকদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি মনে হল আপনাদের? গান ভালো লেগেছে?

সব শিক্ষক মাথা নেড়ে বললেন, জী স্যার, ছেলেটির কণ্ঠ চমৎকার।

তবে কি ওকে ভর্তি করা যায় ? তালুকদার স্যার সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন! সব স্যারই তখন মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

এতক্ষণ পর তালুকদার স্যারের মুখে কিঞ্চিৎ হাসি দেখলাম। তিনি বাবাকে লক্ষ করে বললেন, কগ্রাচুলেশন, আপনার ছেলেকে ভর্তি করে নেয়া হল। এই বলে তিনি বাবার সাথে হাত মিলালেন। বাসায় এসে বাবা মাকে বললেন, তোমার ছেলে ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করে স্কুলে ভর্তি হয়েছে। বিষয়টা জানার পরে বাসায় একটা হাসির রোল পড়ে গিয়েছিল। এইভাবেই আমি স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হলাম এবং আমার স্কুল জীবন শুরু হল।

পাকিস্তান কোয়ার্টার থেকে আমরা ১০-১২ জন ২ মাইলের মতো হেঁটে স্কুলে যেতাম। আর মেয়েরা ঘোড়ার গাড়িতে করে স্কুলে যেত। স্কুল ছুটির পর একইভাবে আমরা বাসায় ফিরে আসতাম। আমরা বাঙালিরা যেহেতু সংখ্যালঘু ছিলাম সেহেতু সব সময় আমরা দলবদ্ধ হয়ে চলতাম এবং খেলতাম। আমাদের প্রধান শত্রু ছিল বিহারি। বাংলাদেশে বিহারিদের উপর অত্যাচার হলে ওরা আমাদের উপর অত্যাচার করতে চেষ্টা করত। নানান অজুহাতে ওরা গায়ে পড়ে আমাদের সাথে ঝগড়াবিবাদে লিপ্ত হত। রাস্তায় দেখা হলেই আজেবাজে গালাগাল করত। খেলার মাঠে আমাদের বল নিয়ে যেত। অযথাই ঢিল ছুড়ে মারত। আমরা দলবদ্ধ থাকলে তখন ওরা ভয় পেত। তাই আমরা ক্রিকেট, ফুটবল যাই খেলতাম, ১০/১২ জন মিলে খেলতাম। তবে এটাও ঠিক, আমরা সুযোগ পেলে বিহারিদের ভালোমতো ঠেঙ্গাতাম। বিহারিরাও সব সময় আমাদের জব্দ করার প্রচেষ্টায় থাকত। তবে ওরা বাঙালিদের তুলনায় অনেক ভীতু প্রকৃতির। একবার আমি আর আমার ছোট ভাই বাদল আমাদের বাসার অদূরে খেলার মাঠে বল নিয়ে খেলতে গেলাম। আমি জানি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের খেলার সাথীরাও চলে আসবে। আমাদের দুজনকে দেখে ৩/৪ জনের একটা বিহারির দল এসে বলল, আমরাও খেলব তোমাদের সাথে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলাম। ওমা ওরা তো খেলতে আসেনি। খেলার ছলে আমাদের দু'ভাইকে ধাক্কা মারছে, ল্যাং মেরে ফেলে দিচ্ছে। আমরা ক্ষণিকেই ওদের মতিগতি বুঝে ফেললাম। আমি বললাম, তোমরা চলে যাও, আমি

তোমাদের সাথে খেলব না। ওরা আমাদের বল নিয়ে চলে যাচ্ছিল। আমি চিৎকার করে বললাম, বল দিয়ে যা শয়তান।

ওরা আমার কথা ভ্রূক্ষেপ না করে চলে যাচ্ছিল। আমি তখন দৌড়ে গিয়ে যার পায়ে বল ছিল তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তারপর শুরু করলাম বাঙালি স্টাইলে কিল আর ঘুষি। আমার ছোট ভাইও দৌড়ে এসে আরেকজনকে ধরার চেষ্টা করল। আমার কিলঘুষি খেয়ে বিহারি ছেলেটি মাটিতে পড়ে গেল। আর তাই না দেখে বাকিগুলো বল ফেলে দিয়ে লেজ গুটিয়ে পালাল। মার খাওয়া ছেলেটিও উঠে দে দৌড়। ওদের এই কাণ্ড দেখে আমি আর আমার ছোট ভাই বাদল হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খাচ্ছিলাম। এরই মধ্যে আমাদের অন্য বন্ধুরা এসে গেল। তাদেরকেও ঘটে যাওয়া কাহিনী শোনালাম। ওরাও শুনে হাসতে লাগল। বন্ধুরা বলল, চল ওদের খুঁজে ধরে এনে আরেকটি ধোলাই দেই। আমি বললাম, না থাক, আমি যা দিয়েছি তাতেই ওদের শিক্ষা হয়ে গেছে। এমনি ভীতুর ডিম এই বিহারিরা।

আমার স্কুলজীবন ছিল আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন। আমি যেহেতু গান করতাম সেহেতু স্কুলের সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমার ডাক পড়ত। গানের সুবাদে আমার বন্ধুর সংখ্যাও ছিল অনেক। টিফিন পিরিওডে যখন সবাই খেলাধুলা আড্ডা-খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত, তখন আমি ক্লাসের পিছনের বেঞ্চে বসে আমার বন্ধুদের নিয়ে গানের আসর জমিয়ে দিতাম। বন্ধুরা বিভিন্ন গানের অনুরোধ করত আর আমি বেঞ্চে তবলা বাজিয়ে একের পর এক গান গেয়ে যেতাম। ক্লাস রুম ছেলেদের ভিড়ে উপচে পড়ত। ঘণ্টা বাজার সাথে সাথেই যে যার ক্লাসে চলে যেত। স্কুল ছুটির পর আমরা যখন স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে বের হতাম একই সময়ে অন্যান্য স্কুল থেকে ছেলেরাও বের হত। ওদের মধ্যে কিছু বিহারি আর পাঞ্জাবি আমাদের সাথে ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ত। তারপর চলত ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া। আমাদের ক্লাসের কিছু ছেলে ছিল দুর্দান্ত সাহসী। তাদের নাম আজো মনে পড়ে, মমিনুল হক বাচ্চু, তাহামিন, আশরাফ, আনসার ওরা সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়ত বিহারিদের উপর। আমরা পিছন থেকে সহযোগিতা করতাম।

আমাদের আগ্রাসনের কাছে ওরা তখন পিছু হটতে বাধ্য হত। যে যেদিকে পারে ছুটে পালাত। আমরা সবাই তখন হৈ হৈ করতে করতে বাড়ি ফিরতাম। মনে হত যুদ্ধে জয়ী হয়ে বাড়ি ফিরছি। এইরকম পরিস্থিতি

আমাদের প্রায়ই হত আর সব সময়ই আমরা জয়ী হতাম। তবে এমন ঘটনাও ঘটেছে যে আমাদের কোনো বন্ধুকে একা পেয়ে তারা বেদম প্রহার করেছে। সেই জন্যই আমরা দলবদ্ধ হয়ে চলার চেষ্টা করতাম, বিশেষ করে স্কুলে আসার সময় এবং ছুটির পর বাসায় ফেরার সময়। এভাবেই চলে গেল আমার সপ্তম শ্রেণির স্বর্ণালি দিনগুলো।

১৯৬৯ সাল। আমি অষ্টম শ্রেণিতে উঠেছি। এর মধ্যে বাবা এসে একদিন বললেন, আমরা এই বাসা ছেড়ে দিচ্ছি। এর চেয়ে অনেক বড় বাসা পেয়েছি কুইন্স রোডে। আমরা সেখানেই যাচ্ছি এই মাসের শেষে সপ্তাহে। পাকিস্তান কলোনির এই বাসাটাও ভালো ছিল কিন্তু অনেক ছোট ছিল। তাই বাবা এই বাসাটা পাওয়ার পর থেকেই বড় বাসার জন্য আবেদন করে রেখেছিলেন। আমরা কুইন্স রোডে নতুন বাসায় গিয়ে উঠলাম। সত্যি বিশাল বড় পাথরের তৈরি বাড়ি। এই বাড়িগুলো বানানো হয়েছিল নৌবাহিনীর অফিসারদের জন্য। তাই আমাদের চারপাশেই সব নৌবাহিনীর অফিসারদের বাসা। অদূরে সমুদ্রের পাশেই ছিল নৌবাহিনীর ঘাঁটি। বাবা বললেন, ইঞ্জিনিয়ারদের কোয়ার্টার খালি ছিল না বলেই আমাদের এই বাড়ির অফার দেয়া হয়েছিল। সমুদ্রের পারে খোলামেলা পরিবেশ। আমার খুব পছন্দ হয়েছে তাই নিয়ে নিলাম। আমাদেরও সবার খুব পছন্দ হয়েছিল। বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই রকম শক্ত পাথরের বাড়ি কেন? বাবা বললেন, বাড়ির আশেপাশে বম্বিং হলেও যেন বাড়ির ভিতরের লোকদের তেমন ক্ষতি না হয়।

বম্বিং কেন হবে বাবা? আমি প্রশ্ন করলাম।

এখানে তো সব বড় বড় পাঞ্জাবি নেভি অফিসারদের বাড়িঘর। যুদ্ধ লাগলে শত্রু পক্ষ এখানেই আগে বম্বিং করবে। বাবা আমাকে বুঝালেন।

আমি মনে মনে কিছুটা ভয় পেলাম। আবার একটু আশ্বস্ত হলাম এই ভেবে যে শক্ত পাথরের বাড়ি বম্ব মেরে এই পাথর ভেদ করা সম্ভব নয়। তবে সত্যিই একাত্তরে ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধের সময় আমাদের বাসা থেকে প্রায় কোয়ার্টার মাইল দূরে রাত ৩টার সময় ভারতের প্লেন থেকে বোমা বর্ষণ হয়েছিল। সেকি বিকট শব্দ! আমাদের কান ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সবার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। সকাল বেলা আমরা সবাই দেখতে গিয়েছিলাম যেখানে বোম ফেলা হয়েছিল। একটা বিশাল পুকুরের মতো গর্ত হয়ে রয়েছে সেখানে। পাথরের বাড়ি বলেই আমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি। যাইহোক, ২/৩ টি বাঙালি পরিবার পেলাম আমাদের নতুন

জায়গায়। একটু দূরে হলেও হেঁটে যাওয়া যায়। বাসার কাছেই বাস স্ট্যান্ড ছিল, স্কুলে যেতে অসুবিধা হত না। ১৯৭০ সাল, আমি ক্লাস নাইন এ উঠেছি। তখন থেকেই শুনছি একটুআধটু, বাবা এবং তার বন্ধুরা দেশে নির্বাচন নিয়ে আলাপ করছেন। প্রায়ই বিকেলবেলা বাবার বন্ধুরা আমাদের বাসায় আসতেন। জমিয়ে তাস খেলতেন। চা, সিগারেট চলত। সেই সাথে রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা। আর আমরা চলে যেতাম সমুদ্র সৈকতে। করাচির মনোরম সমুদ্র সৈকত ক্লিফটন ছিল আমাদের বাসা থেকে কাছেই। আমার কিছু সিন্ধি বন্ধু জুটল সেখানে। ওরা আমার গান শুনে আমার ভক্ত হয়ে গেল। সুতরাং প্রতিদিনই আমাদের একটা রুটিন হয়ে গেল, স্কুল থেকে এসে বিকেলবেলা আমার ছোট দু'ভাই, সিন্ধি বন্ধু সবাই মিলে সমুদ্রের পারে গিয়ে গান করা আর আড্ডা দেয়া। সন্ধ্যার আগেই আবার বাসায় ফিরে আসা।

বাসায় এসে দেখতাম বাবা তখনও আড্ডা দিচ্ছেন বন্ধুদের সাথে। আড্ডার মূল বিষয় বর্তমান রাজনীতি। আমি কখনোই রাজনীতি পছন্দ করতাম না। কিন্তু যখন দেখলাম এই রাজনীতি আমাদের বাঙালিদের বাঁচামরার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন বাবাদের রাজনৈতিক আলাপে আমিও যোগ দিয়ে শুনতাম। তখন রাজনৈতিক আলাপের মূল বিষয় ছিল শেখ মুজিব, আওয়ামী লীগ আর জুলফিকার আলী ভুট্টো, পিপলস পার্টি। এরই মধ্যে শুনলাম শেখ মুজিবুর রহমান করাচিতে আসবেন তার নির্বাচনী ভাষণ দিতে। আমরা সবাই গিয়েছিলাম তার ভাষণ শুনতে। মাঠভর্তি জনগণ। অনেক সিন্ধি পাঠানরাও এসেছিল সেই ভাষণ শুনতে। এইভাবেই একদিন নির্বাচনের দিন এসে গেল। জানতে পারলাম পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে। আমরা খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলাম। ঘরে ঘরে মিষ্টি বিতরণ চলল কয়েকদিন ধরেই। বাবা বললেন, এবার যদি বাঙালিদের ভাগ্য ফেরে! বাঙালিরা অনেক আশায় স্বপ্ন দেখতে লাগল। পশ্চিম পাকিস্তানে অবশ্য ভুট্টো জয়লাভ করেছে। তাতে কি হবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ভোটার অনেক বেশি। সেই সূত্রেই আওয়ামী লীগ জয়লাভ করেছে। জনাব ভুট্টোর মাথা খারাপ হয়ে গেল ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে দেখে। তারপর শুরু হল ভুট্টোর ষড়যন্ত্র আর ঘৃণ্য চক্রান্ত। সে কোনোভাবেই ক্ষমতা শেখ মুজিবের হাতে তুলে দেবে না। তারপরের ঘটনা তো সবারই জানা। দিন দিন পরিস্থিতি খারাপের দিকে যেতে লাগল। ১৯৭১ সাল আমি ক্লাস টেনে উঠেছি মাত্র।

বাংলাদেশে তখন দুর্বার আন্দোলন শুরু হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পর্ক অবনতির দিকে যেতে লাগল। এক সময় এই অসহযোগ আন্দোলন স্বাধীনতার সংগ্রামে রূপ নিল। আমরা যারা বাঙালি পশ্চিম পাকিস্তানে আটকা পড়ে গেছি, তখন থেকেই আমাদের উপর বিহারি পাঞ্জাবিদের ভাবমূর্তি খারাপ হতে লাগল। বাবা আমাদের সবাইকে ডেকে বললেন, আমাদের সময় এখন খারাপ। পথেঘাটে কেউ কখনো বাজে কটূক্তি বা গালাগাল করলেও তোমরা কিচ্ছু বলবে না। তোমরা জানো আমরা নির্বাচনে জয়লাভ করার পরও আমাদেরকে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি, বরং নির্যাতন চালাচ্ছে আমাদের উপর। সুতরাং আমরা কখনো এদের ক্ষমা করব না। তোমরা খুব সাবধানে থাকবে। চুপচাপ স্কুলে যাবে এবং চুপচাপ চলে আসবে। কারো সাথে কোনো আলাপ করবে না। বাসা থেকে কম বের হবে। ঘরে বসেই খেলবে, বাইরে যাবার প্রয়োজন নেই। বাবার কথা শুনে আমরা অনেকটা ঘাবড়ে গেলাম। মনের মধ্যে নানান ভয় ঢুকে গেল। কিছুদিন অবশ্য আমরা বাসায় খেলা করেছি। দেশের এই অবস্থা দেখে মা ভীষণ চিন্তা করতে লাগলেন, দেশে আর যেতে পারবেন কিনা! মায়ের এই অবস্থা দেখে, বাবা মাকে বললেন, এখনো তো তেমন একটা খারাপের দিকে যায়নি, হয়তো অবস্থা ভালোও হয়ে যেতে পারে। তুমি বরং দেশে গিয়ে একবার তোমার ভাই-বোন-আত্মীয়-স্বজন সবার সাথে দেখা করে এসো। মা রাজি হয়ে গেলেন এবং একাই দেশে চলে গেলেন।

কিন্তু না, দেশের অবস্থা ভালো হল না। দিন দিন খারাপ থেকে খারাপের দিকে ধাবিত হতে লাগল। বাবাকে দেখতাম, বিবিসি টিউন করে রেডিওতে খবর শুনতেন। আকাশ বাণী শুনতেন। সমুদ্রের শাখাপ্রশাখা আমাদের বাড়ির কাছেই ছিল। তাই প্রতিদিন বিকেলবেলা আমরা চার-পাঁচ ভাই সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে বসতাম, খেলতাম। সন্ধ্যার আগেই আবার বাসায় ফিরতাম। এই ছিল আমাদের দৈনন্দিনের রুটিন।

১৯৭১ সাল। দেশের অবস্থা খুবই খারাপ। শেখ মুজিবের সাথে কোনো আলাপ-আলোচনাই সফল হয়নি। সুতরাং দেশের অবস্থা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করছে দিন দিন। বোঝা গেল কোনো অবস্থাতেই পশ্চিমারা ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না, বরং পশ্চিমা সেনাবাহিনী দিয়ে আমাদের দেশের নিরীহ মানুষদের গুলি করে হত্যা করছিল। ওরা ভেবেছিল বাঙালিরা কাপুরুষ। কয়েকজনকে গুলি করে মারলেই বাঙালিরা ভয় পেয়ে যাবে। তারপর ওরা যা বলবে বাঙালিরা তাই করবে। কিন্তু ওদের ধারণা ভুল প্রমাণিত করে

বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে নেমে গেল। পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের ভাঙন অবধারিত আমরা জেনে গেলাম। পশ্চিমাদের সাথে বাঙালিদের যোগাযোগ কমে আসতে লাগল। টেলি যোগাযোগ, ডাক যোগাযোগ, বিমান যোগাযোগ প্রায় বন্ধের দিকে। এমন সময় ঢাকা থেকে একটা ফোন কল এল আমার মায়ের। মা বললেন, ঢাকা টু করাচি শেষ ফ্লাইট আজকে। আমি অনেক চেষ্টা করে একটা টিকেট ব্যবস্থা করেছি। বাবা উত্তেজিত হয়ে মাকে বললেন, তুমি কি পাগল হয়েছ? এই সময় এখান থেকে সবাই পালাতে পারলে বাঁচে আর তুমি আসার জন্য চেষ্টা করছ! এখানে আমাদের কি হয় তার কোনো ঠিক নাই! তুমি কোনোভাবেই আসার চেষ্টা কর না! মা বললেন, তোমরা ওখানে বিপদে থাকবে আর আমি এখানে তোমাদের ছেড়ে কিভাবে থাকব! মরতে হয় একসাথেই মরব! আমি আসছি! মা কিছুতেই কিছু শুনলেন না। মা ঢাকা টু করাচি লাস্ট ফ্লাইটে ঠিকই চলে আসলেন করাচি বিমান বন্দরে। আমরা অনেক খুশি হলেও বাবা অনেক বকা দিলেন মাকে। বাবা মাকে বকা দিতে দিতে কেঁদে ফেললেন! মাও আমাদের জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদলেন!

কিন্তু মা আসার পর থেকে আর কোনো যোগাযোগ করতে পারলেন না ঢাকাতে তার ভাই-বোন-আত্মীয়-স্বজনদের সাথে। সেই জন্য তার মন সব সময় খারাপ থাকত। বাবাকেও দেখতাম সব সময় তার চোখেমুখে একটা আতঙ্কের ভাব। প্রায় বলতেন, কাজের অবস্থা খুব খারাপ। কখন যে কি হয়! সবার ভিতরে একটা চাঁপা আক্রোশ বাঙালিদের উপর!

সত্যি একদিন বাবা বাসায় এসে বললেন, আমাকে আর অফিসে যেতে হবে না!

আমাকে বাসায় থাকতে বলেছে। কোথাও যেতে হলে পুলিশের অনুমতি নিয়ে যেতে হবে। অনেকটা হাউজ এরেস্টের মতো। আমাদের সবার মনটা খারাপ হয়ে গেল! এভাবে কতদিন থাকতে হবে কে জানে!

এদিকে দেশের অবস্থা আরও খারাপ হতে লাগল ২৫শে মার্চের ঘটনার পর থেকে রীতিমতো মুক্তিযুদ্ধ শুরু হল। বাবা আমাদের বললেন, তোরা কেউ ঘর থেকে বের হবি না, দেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আমরা বাবার অজান্তে বাসার কাছাকাছি একটা ছোটো মাঠ ছিল, সেখানে খেলতে যেতাম। আমাদের সাথে ৩/৪ জন পাঞ্জাবি ছেলে আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের সাথে খেলায় যোগ দিত। ওরা খুব ভালো ছিল। কখন আমাদের বিরক্ত করত না। সব সময় বন্ধুসুলভ ব্যবহার করত। আমাদের পাঞ্জাবি

প্রতিবেশীরাও কখনও আমাদের সাথে বাজে ব্যবহার বা উত্যক্ত করত না। বরং মাঝেমধ্যে খোঁজখবর নিত। আমার বাবা বলতেন, সব পাঞ্জাবি খারাপ নয়, খারাপের মধ্যেও কিছু ভালো থাকে।

আমাদের খেলার মাঠে কোত্থেকে একদিন একটা বিহারি এসে জুটল! কথায় কথায় আমাদের শুধু আজেবাজে কথা বলত, আমরা কিছুই বলতাম না! জানি কিছু বললেই ঝগড়া বেঁধে যাবে। বিহারির কাণ্ড দেখে পাঞ্জাবি ছেলেরা বলত, আরে ভাই, কিউ তাঙ্ক কারতেহ। বাঙালি হ্যাঁয় তো কেয়া হ্যাঁয়। তমহারা তোঁ কুচ নেহি বিগারা! বিহারি খেপে গিয়ে বাজে একটা গালি দিয়ে বলল, ইয়ে সালা বাঙালি গাদ্দার কউম হ্যাঁয় উও আপনা দেশমে হামারা ভাই কো মার রাহা হ্যাঁয়। সেদিন আর আমরা না খেলে চুপচাপ ঘরে ফিরে এলাম। পরের দিন খেলতে গিয়ে দেখলাম সেই বিহারি আবার এসে হাজির। এসে বলল, সেও খেলতে চায় আমাদের সাথে। আমরা কিছু না বলে খেলতে নিলাম। ওমা ও দেখি একটু পর পর আমাকে ধাক্কা দেয়, ল্যাং মারে, পাঞ্জাবি ছেলেদের কিছু করে না! আমি বললাম, আরে তুম মুঝে ধাক্কা কিউ মারতেহ! বিহারি খেপে গিয়ে বলল, খামুশ গাদ্দার। এই বলে সে আবার আমাকে ধাক্কা দিল! আমি কিছুক্ষণের জন্য ভুলেই গিয়েছিলাম দেশের কথা। ততক্ষণে আমার মাথায় খুন চেপে গেছে! আমিও ঘুরিয়ে দিলাম এক ঘুষি ওর চোয়ালে! শুরু হয়ে গেল মল্লযুদ্ধ। এদিকে আমার পাঞ্জাবি বন্ধুটা দৌড়ে তার বাসায় গিয়ে তার মাকে ডেকে আনল। এবং সে তার মাকে বুঝিয়ে দিল ওই বিহারি ছেলেটা আমাদের রোজ বিরক্ত করে আর আমাকে গাদ্দার বাঙালি বলে গালাগাল করে, ধাক্কা দেয়, ল্যাং মারে ইত্যাদি। বন্ধুটির মা ছিল বিশাল দেহি এক দজ্জাল প্রকৃতির মহিলা! আমরা কোনোদিন ভুলেও তার সামনে যেতাম না! সব শুনে সে বিহারি ছেলেটাকে কান ধরে বলল, তেরা ঘাড় কিধার হ্যাঁয়। কাহা রেহেতেহ? বিহারিটা আমাদের এলাকায় থাকত না। বন্ধুটির মা বিহারিকে বলল, ফির কাভি ইধার আয়া তোঁ তেরা টাঙ্গে তোর দুঙ্গা সামঝা! বাঙালি কো মারনা হ্যাঁয় তো বর্ডার মে যাও! ইয়ে বাঙালি কা কেয়া কাসুর হ্যাঁয়! তারপর আমাকে বলল, তোমরা এখানে রোজ খেলবা। কেউ যদি কিছু বলে বা তোমাদের বিরক্ত করে আমাকে জানাবা, আমি ওদের সোজা করে দেব! আমি কোনোদিন তার কথা ভুলিনি। তার স্বামী নৌবাহিনীর একজন কমান্ডার, নাম মালিক। সবাই তাকে কমান্ডার মালিক বলে ডাকত। তারপর থেকে আর সেই বিহারি কখনো আমাদের এলাকায় আসেনি।

আমার বাবাকে দেখতাম, সারাদিন রেডিও কানের কাছে নিয়ে বিবিসি কিংবা আকাশবাণী শুনতেন। এবং দেশের খবরাখবর আমাদের জানাতেন। কিন্তু আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুনতে পেতাম না। রেডিওতে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি কিন্তু পাইনি। তবে আমরা দেশের খবর ঠিকই পেতাম। দেশের অবস্থা আরও খারাপ হতে লাগল। গ্রামেগঞ্জে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতায় পাকিস্তানি সেনারা অস্থির শুনতে পেলাম, লক্ষ লক্ষ নিরীহ বাঙালি ভারতের শরণার্থী হচ্ছে। পাকিস্তানি সেনাদের নৃশংস অত্যাচার। আমাদের মা-বোনদের সম্ভ্রম হানি করা হচ্ছে। তার উপরে আবার রাজাকারদের কুকর্ম! দেশের সাথে তাদের বেইমানি– এই সব সংবাদ আমরা রোজই পেতাম। আর এই সব শুনে আমার মা বাবা খুব কষ্ট পেতেন। আমরাও তখন বড় হয়েছি বুঝতে শিখেছি। আমাদেরও তখন রাগে দুঃখে বুকটা ফেটে যেত। মনে হত, ইশ, আমরা যদি এই সময় দেশে থাকতাম, তাহলে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারতাম। মুক্তিবাহিনী নামটা শুনলে আমরা সাহসী হয়ে উঠতাম। গর্বে বুকটা ভরে যেত! তেমনি আবার এই পশ্চিমারা মুক্তিবাহিনীর নাম শুনলে আত্মা শুকিয়ে যেত!

মাঝে একদিন আমাদের পাশের বাসার লেফটেন্যান্ট হাবিব ও তার স্ত্রী আমাদের বাসায় এসে হাজির! দেখলাম তাদের চোখেমুখে কেমন যেন একটা চিন্তার আভাস! বাবা তাদের বসতে দিলেন। ওদের সাথে আমাদের বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল।

লেফটেন্যান্ট হাবিবের স্ত্রী একটু কাচুমাচু হয়ে বাবাকে বললেন, ভাই বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী কি খুব বিপদজনক! পাকিস্তানি পাঞ্জাবি দেখলেই কি তারা মেরে ফেলে ? বাবা তার কথা শুনে তো অবাক! বাবা বললেন, কেন হঠাৎ এই কথা! জনাব হাবিব বললেন, আরে তেমন কিছুই না! এই মাসের শেষের দিকে আমাদের দুটি জাহাজ সেনাবাহিনী নিয়ে বাংলাদেশে যাচ্ছে অপারেশনে! আমাকেও তাদের সাথে পাঠাচ্ছে এই কথা শুনে আমার স্ত্রীর নাওয়া-খাওয়া হারাম! আমার স্ত্রী বলে, বাংলাদেশে নাকি মুক্তিবাহিনী নামে একটা গেরিলা দল আছে। ওরা খুবই সাংঘাতিক বিপদজনক। পাঞ্জাবি দেখলেই নাকি মেরে ফেলে! ওদের কেউ খুঁজে পায় না! আমি বললাম, আমার তো ভয়ের কিছু নাই, আমি থাকব জাহাজে! তারপর বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি কিছু জানেন এই মুক্তিবাহিনীর বিষয়? ওরা আসলে কারা! ওরা কি ভারতের লোক! বাবা অনেকটা আকাশ থেকে পড়লেন ভাব দেখিয়ে বললেন, আমি তো দীর্ঘদিন যাবত পাকিস্তানে থাকি।

তারপর আবার সব যোগাযোগ বন্ধ! ফোন লাইন ওপেন থাকলে কল করে জিজ্ঞেস করতে পারতাম, মুক্তিবাহিনী কি জিনিস! আপনার স্ত্রী যা জানে আমি তাও জানি না! আমি তো এক প্রকার ঘরবন্দি! বাবা আরও বললেন, আপনি অনেক ভালো মানুষ। আল্লাহ আপনাকে ভালো রাখবে ইনশাল্লাহ! আমরা সবাই আপনার জন্য দোয়া করব! দেখলাম মিসেস হাবিব কেঁদে ফেললেন! আমরা অনেক সমবেদনা জানালাম। পরে লেফটেন্যান্ট হাবিব ফিরে এসেছিলেন কিনা জানি না!

দেশের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেল! পাকিস্তানি সেনারা রাজাকারদের সহযোগিতায় আমাদের দেশের মানুষদের নির্বিচারে হত্যা শুরু করল! ভারতে কোটি কোটি বাংলাদেশি আশ্রয় নিল! ভারত উপায় না দেখে বাংলাদেশকে সরাসরি সাহায্য করতে লাগল! পাকিস্তান আগে থেকেই ভারতের উপর ক্ষ্যাপা ছিল! এখন বাংলাদেশকে সাহায্য করতে দেখে গরম তেলে যেন পানির ছিটা পড়ল! পাকিস্তানিদের মাথা গরম, তাই ভারতের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিল! শুরু হল যুদ্ধ! তখন পাকিস্তানে বসবাসকারী বাঙালিদের সাথে পাকিস্তানি সরকার চরম দুর্ব্যবহার শুরু করল! শুধু সরকারই নয়, পাকিস্তানের জনগণ ও বাঙালিদের যেখানে দেখে নানান রকম বাজে মন্তব্য করে। তবে সিন্ধিরা আমাদের মতোই নিরীহ প্রকৃতির। তারা কখনও আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করত না। পাঠান মাক্রানি এরাও ভালোই ছিল! তার কারণ হয়তো, ওরা পড়ালেখা কম জানত। দেশের রাজনীতির কোনো খোঁজখবর রাখত না। পাকিস্তানি সরকার বাঙালিদের উপর অসন্তোষ হবার আরেকটি কারণ হয়তো ছিল, সেটা হল পশ্চিম পাকিস্তানে যত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল, যুদ্ধ শুরু হবার পর তারা আগের মতো ভারতকে শত্রু মনে করত না। কারণ তারা জানত, ভারত বাংলাদেশকে শতভাগ সাহায্য করছে। ভারত বাংলাদেশের পরমবন্ধু। সুতরাং বিমানবাহিনী, স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী যেখানেই বাঙালি ছিল, তারা ভারতকে বাঁচিয়ে যুদ্ধ করেছে। এমনকি বাংলাদেশি বৈমানিকদের ভারতে যখন বম্বিং করতে পাঠাত তখন কিছু বাঙালি পাইলট ভারতে ল্যান্ড করে আত্মসমর্পণ করে। এবং সেই পাকিস্তানি প্লেন নিয়ে করাচিতে বম্বিং করতে আসত! বাবা এবং তার বন্ধুরা এই সব বিষয় নিয়ে যখন আলাপ করত, আমরা শুনে ভীষণ আনন্দ পেতাম! সর্বক্ষেত্রে বাঙালিরা অসহযোগ করেছে পাকিস্তানিদের! আমার বাবা যেহেতু ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন সেহেতু পুলিশের নজর সব সময় আমাদের বাড়ির দিকে থাকত। একদিন মাঝ

রাতে পুলিশ এসে আমার বাবাকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন, আমরা তো ভয়ে অস্থির! এবার বুঝি বাবাকে ধরে নিয়ে যাবে। পুলিশের একটি দল ঘরে ঢুকে সমস্ত বাড়িটা তল্লাশি করে তছনছ করে ফেলল! মা তো কান্নাকাটি করে সংজ্ঞা হারাবার মতো! অবশেষে কিছু না পেয়ে তারা চলে গেল!

আমরা যেন নতুন জীবন পেলাম!

আমরা ক'ভাই মিলে আবার সমুদ্রের পাড়ে ঘুরতে যেতাম। তখন দেখতাম, ১৪/১৫টা ভারতীয় বোমারু প্লেন আমাদের মাথার উপর দিয়ে করাচিতে ঢুকে এদিক সেদিক বম্বিং করে আবার নিশ্চিন্তে ফিরে যাচ্ছে। করাচিতে বিহারিদের একটা বিশাল বড় কলোনি ছিল, একদিন শুনলাম সেই কলোনিতে বম্বিং করে সব শেষ করে দিয়েছে! আমরা বুঝতে পেরেছি বাঙালি পাইলটরাই এই কাজ করেছে! কারণ বিহারি কলোনি তো ভারতীয় পাইলটদের চেনার কথা নয়! আমরা কখনও দেখিনি বা শুনিনি পাকিস্তানিরা একটাও ভারতীয় প্লেন ভূপাতিত করতে পেরেছে করাচিতে! চরম মার খেয়েছে পাকিস্তানিরা! তখন পাকিস্তানি সরকার সব বাঙালি সেনাদের নিয়ে বন্দি করা শুরু করল, বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প বানিয়ে! একটু সন্দেহ হলেই বাঙালিদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে! আমরা তখন প্রতিটি মুহূর্ত আতঙ্কে কাটাচ্ছি! ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১! দেশ স্বাধীন হল! সমগ্র দেশ আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়ছে! অথচ আমরা এখানে আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দিহান! আদৌ আমাদের ভাগ্যে কি আছে স্বাধীন বাংলাদেশে পা রাখার! আল্লাহ অসীম রহমতে শুধু আমাদেরকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়নি! শুধু বাবার মুখে শুনি যাদের ক্যাম্পে এ ধরে নিয়ে যায় তাদের কি কষ্ট!

এমপ্রেস মার্কেটের পিছন থেকে গাড়ি বেড়িয়ে পড়ল। করাচি শহর ছেড়ে আমরা চলে যাচ্ছি হাইওয়ের দিকে। শহরের আলো ঝলমল বাতি গুলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছিল। আমাদের গাড়িটি ডিপোট লাইনে অবস্থিত আমাদের বাংলা স্কুল পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল! আমরা দু ভাই ঘাড় বাঁকিয়ে স্কুলটির দিকে তাকিয়ে রইলাম! দীর্ঘ ছয়টি বছর এই স্কুলে আমরা পড়েছি। কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই স্কুলে! আর কখনো আসা হবে না এই স্কুলে! অনেক চেনা জানা আপন রাস্তা আমাদের দিকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছে! ওরা যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না আমাদের এই চলে যাওয়া! ধীরে ধীরে সবকিছু অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার মেজ ভাই এবং আমি একে অন্যের দিকে তাকালাম। লক্ষ করলাম

আমাদের দুজনেরই চোখ জলে ভিজে গেছে। পাশে বসা দুজন বাঙালি জানাল ওরাও পিঠাপিঠি দু ভাই। আমাদের চেয়ে বয়সে ৩/৪ বছরের বড় হবে! করাচি ন্যাশনাল কলেজে পড়ত!

এক সময় দেখলাম কালো মারসিডিস করাচি শহর ছেড়ে হাইওয়েতে গিয়ে উঠল! কালো ঘুটঘুটে অন্ধকার চারপাশ। কিছুই দেখা যায় না। শুধু গাড়ির সমুখের হেডলাইট দুটো রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছে। অন্ধকারের বক্ষ চিরে গাড়ি ছুটে চলেছে বিরামহীন। এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও বুকের ভিতর একটা আনন্দের উত্তেজনা বিরাজ করছিল! সেটা হল, বাংলাদেশ।

৯ মাস যুদ্ধ করে তিরিশ লক্ষ শহিদের বিনিময়ে যে দেশ! একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ বাংলাদেশ! নানান এলোমেলো ভাবনা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল! সবাই আমরা ঝিম মেরে বসে আছি! কেমন যেন একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে গাড়ির ভিতর! মাঝে মধ্যে সামনে বসা ড্রাইভার ক্ষীণ স্বরে তাদের নিজেদের ভাষা পশতুতে কথা বলছে! এমন সময় নীরবতা ভঙ্গ করে সুলতান মাহমুদ খান উচ্চ কণ্ঠে আমাদের জিজ্ঞেস করল, বাঙালি বাবু তুম সাব খামুস কিউ বায়ঠে হো! হামকো বোলো তুম কিধার যাতা হ্যাঁয় খোঁচে? আমরা প্রায় সবাই একসাথে আনন্দে বলে উঠলাম, বাংলাদেশ যাতা হ্যাঁয় খান ভাই! আমাদের কথা শুনে খান বিরক্ত হয়ে বলল, কেয়া বোলটা হ্যাঁয় খোঁচে আভি ইয়ে মাত বোলো ইয়ে বোলোগে তো হাম সাব মারা জায়েঙ্গে !

তারপর খান আমাদের বুঝিয়ে বলল, রাস্তায় যদি কোনো পুলিশ আমাদের গাড়ি থামিয়ে তোমাদের জিজ্ঞেস করে, তোমরা কোথায় যাচ্ছ, তোমরা সবাই বলবে, আমরা শাহবাজ কালান্দারের মাজার জিয়ারত করতে যাচ্ছি! এই সেই শাহ্‌বাজ কালান্দার যার নামে একটি বিখ্যাত কাওয়ালি রচনা করা হয়েছিল। 'দামা দাম মাস্ত কালান্দার আলিদা পেহেলা নাম্বার, ও লাল মেরিপাত রাখিয়ো ভালো৷ ঝুলে'। আমরা সবাই মাথা ঝুলিয়ে বললাম, আচ্ছা খান ভাই, তুম যো বোলতা হ্যাঁয় ওহি বোলেগা। গাড়ি তার নিজস্ব গতিতে ছুটে চলেছে। আবার সেই নীরবতা। ঘণ্টা খানেক পর খান আবার উচ্চ স্বরে আমাদের জিজ্ঞাসা করল, বাঙালি বাবু তুম কিধার যাতা হ্যাঁয় ? আমরা আবারও ভুল করে প্রথমে বাংলাদেশ বলে ফেললাম! তারপর আবার ভুল সংশোধন করে বললাম, শাহ্‌বাজ কালান্দার কা মাজার জিয়ারত কারনেকো যাতা হ্যাঁয়! খান এরপর দু এক ঘণ্টা পরপর আমাদের জিজ্ঞেস করতে থাকল, আমরা কোথায় যাচ্ছি! প্রথমে আমরা দু তিন বার ভুল

করলেও পরবর্তীতে আর ভুল হয়নি। এইভাবে ৭/৮ ঘণ্টা কেটে গেল! আমাদের চোখে কিন্তু ঘুম নেই! হঠাৎ পাঠান আমাদের বলল, সামনে পুলিশ চেক পোস্ট! গাড়ি থামাতে হবে। তোমাদের মনে আছে তো কি বলবে ? আমরা সবাই বললাম, হুম মনে আছে। রাত তখন ভোর হয়ে গেছে, দেখলাম দুজন পুলিশ এসে আমাদের উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখছে।

আমাদের চেহারায় তো খাঁটি বাঙালির ছাপ রয়েছে ! একজন পুলিশ জিজ্ঞেস করল, তুম সাব বাঙালি হ্যাঁয়! আমরা মাথা ঝুলিয়ে বললাম, হুম! কিধার যাতা হ্যাঁয় ? আমরা প্রায় সবাই একসাথে বলে ফেললাম, শাহ্বাজ কালান্দার কা মাজার জিয়ারাত কারনেকো যাতা হ্যাঁয়! এই কথা বলার পর আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিল! আবার গাড়ি ছুটে চলল বিদ্যুৎ গতিতে! কিছু দূর যাবার পর পাঠান খান সাহেব সজোরে হেসে উঠে বলল, শাবাশ বাঙালি বাবু শাবাশ! তুম সাব কামাল কার দিয়া। আরও ২/৩ ঘণ্টা গাড়ি চলার পর পাঠান বলল, আমরা শাহ্ বাজ কালান্দারের মাজার পার হয়ে চলে যাচ্ছি, দু ঘণ্টা পর আমরা এক জায়গায় থামব।

তোমরা সেখানে নেমে পড়বে। কারণ আমাদের আরও দুটো লরি ট্রাক আসছে। ওদের সাথে আমরা একসাথে যাব এখন কোনো পুলিশ যদি আমাদের গাড়ি থামায়, তোমরা বলবে, তোমরা এখানে পিকনিক করতে এসেছ! ভুলেও আর শাহ্ বাজ কালান্দারের নাম নিও না! আমরা সবাই মাথা ঝুলিয়ে বললাম, হুম! অবশেষে দু ঘণ্টা পর গাড়ি থামল রাস্তার ডান দিকে এক পাশে! সহকারী ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমেই গাড়ির সামনের হুড খুলে রাখল সবাইকে দেখানোর জন্য যে গাড়ির ইঞ্জিন ট্রাবল দিচ্ছে! রাস্তার দু পাশে ৭ ফিট উঁচু ভুট্টার ক্ষেত! আমাদের বলা হল, রাস্তা থেকে নেমে ভুট্টা ক্ষেতের পাশে গিয়ে একটা চাদর বিছিয়ে সবাই একসাথে বসে গল্পসল্প করতে! গাড়ি থেকে কিছু শুকনো খাবার নিয়ে নিলাম! কেউ যদি আমাদের এভাবে এখানে বসে থাকতে দেখে, জিজ্ঞেস করে আমরা কারা বা এখানেই বা কি করছি! আমরা আমাদের হুড উঠানো গাড়ি দেখিয়ে বলব, আমরা পিকনিকে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে আমাদের গাড়ি বিকল হয়ে পড়ায় আমরা এখানে বসে বিশ্রাম নিচ্ছি! গাড়ির ড্রাইভার গাড়ি ঠিক করার চেষ্টা করছে! গাড়ি ঠিক হলেই আমরা আবার রওয়ানা দেব! এই রকম একটা গল্প সাজানো হল ! পাঠান খান সাহেব আমাদের জানালেন, আমরা প্রায় আফগানিস্তান বর্ডারের সন্নিকট! আর এক শত মাইল ড্রাইভ করলেই সিন্দের চামান বর্ডার আর এই বর্ডার পাস করলেই আফগানিস্তানের

কান্দাহার প্রদেশ! তারপর আর তোমাদের ভয় নেই। আমরা এখানে অপেক্ষা করব আমাদের দুটো লরি ট্রাকের জন্য! সেই ট্রাকেও অনেক বাঙালি রয়েছে। ওরা এলেই আমরা একসাথে রওয়ানা দেব!

অতঃপর আমরা কিছু খাবার নিয়ে ভুট্টা ক্ষেতের পাশে চাদর বিছিয়ে বসে পড়লাম! শুয়ে বসে কিছুটা সময় বেশ ভালোই কাটল! আশেপাশে কোনো বাড়িঘড় ও নজরে পড়ল না, মাইলকে মাইল শুধু ক্ষেত আর ক্ষেত! কোনো মানুষজনও চোখে পড়েনি! সুতরাং আমরা বেশ ভালোই সময় পার করছিলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখলাম আমাদের থেকে অদূরে একজন কৃষক হাতে কাস্তে নিয়ে ভুট্টা ক্ষেতের ভিতর থেকে আমাদের দিকে বারে বারে তাকাচ্ছে। আমরা প্রথমত একটু ভড়কে গেলাম! পরে আবার ভাবলাম, অশিক্ষিত কৃষক, ও আর কি বুঝবে। আমরা ওকে কাছে ডাকলাম কথা বলার জন্য কিন্তু ও আসলো না, কেমন যেন ভয় ভয় ভাব তার চোখে মুখে! ভাবলাম, আমাদের দেখে আবার ভয় টয় পেল না তো! এই নির্জন জায়গায় আমরা বসে আছি দেখে! আবার ভাবলাম, ও যদি আমাদের চোর বা ডাকাত মনে করে গ্রাম থেকে গ্রামবাসী নিয়ে এসে আমাদের ধোলাই দিয়ে দেয়! সিন্ধ এলাকায় সিন্ধিরা সিন্ধি ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা বোঝেও না বা বলতেও পারে না!

সিন্ধিরা বেশির ভাগ লোক অশিক্ষিত কৃষিজীবী এবং বাঙালিদের মতোই নিরীহ প্রকৃতির। তবুও নিজেরা যেচে গিয়ে কথা বলতে চাইলাম আমাদের যেন চোর ডাকাত মনে না করে ! হয়তোবা উর্দু পাঞ্জাবি কিছুটা বুঝতে পারে এই ভেবে আমাদের সাথের সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলাম, তারা কেউ সিন্ধি জানে কিনা তারাও কেউ সিন্ধি জানে না। আমরা নিজেরা এইসব বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিলাম কি করা যায়! অবশেষে আমরা তাকিয়ে দেখি লোকটি উধাও। আমরা তখন বিষয়টি পাঠান খান ভাইকে জানালাম! সে বলল, কোই বাত নেহি হুয়া তো ঠিক হ্যাঁয়! কুচ পারোয়া নেহি খোঁচে! আমরাও একটু নিশ্চিন্ত হলাম। বিকেল ৬টার সময় খান পাঠান বলল, জালদিসে গাড়ি মে উঠো, হামারা ট্রাক আ গিয়া।

দেখলাম বিশাল বড় দুটো লরি ট্রাক ত্রিপল দিয়ে ঢাকা আমাদের গাড়ির সামনে এসে একটুখানি দাঁড়াল। তারপর খান ভাইয়ের সাথে যেন কি বলে আবার চলতে শুরু করল! যাইহোক আমরা আমাদের কাঁথা বালিশ নিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়িতে উঠলাম! গাড়িও সাথে সাথে ছেড়ে দিল। আমাদের ১০০০ গজ সামনে ট্রাক দুটো চলছে আর আমরা পিছু পিছু চলছি

আর ভাবছি, ওই ট্রাকের মধ্যেও নাকি বাঙালিরা যাচ্ছে। কিভাবে যাচ্ছে কে জানে! ট্রাকে যাওয়া নিশ্চয় অনেক কষ্টের! আল্লাহর নিকট হাজারো শুকুর গুজারি করি, আমরা আরামে মারসিডিস গাড়িতে যাচ্ছি! আমরা বর্ডারের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছি। দেখলাম আমাদের সামনের ট্রাক দুটো চেকপোস্টে দাঁড়াল কাগজপত্র দেখাল তারপর সুন্দর মতো বর্ডার পাস করে আফগানিস্তান এর ভিতর ঢুকে গেল! এখন আমাদের পালা! আমরা ধীরে ধীরে আগাচ্ছি! কিন্তু একি বর্ডারে এত লোক কেন! সবার হাতে লাঠিসোটা! পুলিশও দেখা যাচ্ছে! পুলিশ আমাদের গাড়ির দিকে বন্দুক তাক করে আছে! একজন পুলিশ মাইকে বলছে, গাড়ি রোকো নেহিতো গুলি মার দুঙ্গা!

আমি আশেপাশে তাকিয়ে দেখলাম আর কোনো গাড়ি আছে কিনা! হয়তো বা অন্য কোনো গাড়িকে বলছে! নাহ আমাদের গাড়ি ছাড়া তো অন্য কোনো গাড়ি দেখছি না! তার মানে আমাদের গাড়িকেই লক্ষ করে বলছে! এখন উপায়! আমাদের সামনের ট্রাক দুটোকে তো ধরল না! আমাদের ড্রাইভার গাড়িটার গতি কমিয়ে দিল! দেখলাম পুলিশসহ জনগণ লাঠিসোটা নিয়ে দৌড়ে আসছে আমাদের দিকে! এক মুহূর্তেই আমি ভেবে নিলাম আমাদের মৃত্যুদূত ছুটে আসছে! বাঁচার আর কোনো উপায় নেই! মৃত্যু অবধারিত! এত জনগণের সামনে পুলিশের কিছুই করার থাকবে না! গণপিটুনিতে আমাদের জীবনাবসান হতে যাচ্ছে! শেষ বারের মতো আল্লাহকে ডেকে নিচ্ছি! সুরা কলেমা যার যত জানা আছে অবিরাম পড়ে যাচ্ছি! আরেকটি জিনিস আমি লক্ষ করেছি, চোখের সামনে নিজের আজরাইল দেখলে, মানুষ সব কিছু ভুলে যায়! সুরা কালামও ভুলে যায়! কোনো কিছুই মাথায় কাজ করে না! নিজেকে দিয়ে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি! মৃত্যুর জন্য আমরা যখন তৈরি হচ্ছিলাম তখন পাঠান সুলতান মাহমুদখান বলল, ঘাবড়ানেকা কোই বাত নেহি খোঁচে! তোমরা তোমাদের মাথা সিটের নিচে লুকাও! আমি গাড়ি ইউ টার্ন নিচ্ছি! এই বলে খান সাহেব বিদ্যুৎ গতিতে তার গাড়িটি ঘুড়িয়ে ফেলে উল্টো দিকে ধাবিত করল! ততক্ষণে জনগণ ও পুলিশ প্রায় গাড়ির কাছে চলে এসেছিল। গাড়ি ঘুরিয়ে ফেলাতে পুলিশ শুরু করল গুলিবর্ষণ! সেকি গুলির শব্দ টাটা টা ঠা ঠা ঠা গাড়ির বডিতে গুলি এসে লাগছে পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম! আমরা আবার ছুটে চলেছি উল্টো পথে, যেদিক থেকে এসেছিলাম সেইদিকে!

রাস্তার দু পাশে ঘন ভুট্টার ক্ষেত। আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে। খান সাহেব আমাদের দিকে মাথা ঘুরিয়ে বলল, তুম সাব ঠিক হো বাঙালি বাবু !

আমরা সবাই বললাম, হুম ঠিক হ্যাঁয়! আল্লাহ্ তায়ালা ইস দাফা হামে বাঁচা লিয়া! খান সাহেব অনেক দৃঢ়তার সাথে বলল, হাম যাবতাক জিন্দা হ্যাঁয় তুমহারা কুচ নেহি হোগা! ইয়ে হামারা ওয়াদা হ্যাঁয়! এই কথা বলতে না বলতেই আমরা দেখতে পেলাম, আমাদের সম্মুখ থেকে একটা কনভারটিবল পুলিশ জিপ ধেয়ে আসছে! মোট চার জন পুলিশের মধ্যে একজন ড্রাইভ করছে, একজন পুলিশ পিস্তল উঁচু করে ধরে আছে! দুজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। একজনের হাতে একটা মাইক আর অন্যজনের হাতে পিস্তল। দূর থেকে তারা মাইকে বলছে, গাড়ি রোকো গাড়ি রোকো নেহি তো গুলি মার দুঙ্গা! এইবার আমাদের শেষ বাঁচার আশাটুকুও শেষ হয়ে গেল! আমরা সবাই আবার আজরাইলকে আমাদের সামনে দেখতে পেলাম! এবার আজরাইল আর আমাদের না নিয়ে ফিরে যাবে না! আমরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম! খান সাহেব গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। পুলিশের গাড়িও প্রায় আমাদের গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল। এমন সময় দেখলাম, পাঠান খান ভাইয়ের দুই সহকারী ড্রাইভার গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে দুজনে দুদিকে ভুট্টার ক্ষেতের ভিতর উধাও হয়ে গেল। সেই সাথে দুজন পুলিশও ওদের পিছু পিছু ভুট্টা ক্ষেতে ঢুকে পড়ল! বাকি দুজন পুলিশ জিপ থেকে নিচে নামতেই খান চিৎকার করে আমাদের বলল, তুম সাব শের নিচা কারো! বলেই মার্সিডিসের যত পাওয়ার ছিল সব এক সাথে দিয়ে বিদ্যুতের মতো পুলিশের গাড়ির পাশ কাঁটিয়ে বেরিয়ে গেল! পুলিশও গুলি করতে করতে জিপ ঘুরিয়ে আমাদের পিছু নিল! তবে পুলিশ জিপ ঘুরাতে যেটুকু সময় নিল সেই সময়ের ব্যবধানে আমাদের গাড়ি বহু দূরে চলে গেল! খান সাহেব জানেন, বেশিদূর এইভাবে যাওয়া যাবে না! পুলিশ ওয়ারলেসের মাধ্যমে সামনের পুলিশ ফাঁড়িতে গাড়ির নাম্বার দিয়ে দিয়েছে! খুব শ্রীঘ্রই আরেকটি পুলিশ জিপ আমাদের সামনে এসে হাজির হবে! তাই হঠাৎ দেখলাম, আমাদের খান সাহেব তার কালো মার্সিডিস পাশে ভুট্টা ক্ষেতের ভিতর ঢুকিয়ে দিল!

ততক্ষণে রাত হয়ে গেছে ! ৭ ফিট উঁচু উঁচু ঘন ভুট্টার ক্ষেতের ভিতর ঢুকে চোখে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। কারণ খান সাহেব গাড়ির হেডলাইট অফ করে দিয়েছে! শুধু শব্দ পাচ্ছিলাম মচ মচ করে ভুট্টা গাছ ভেঙ্গেচুড়ে গাড়ি এগিয়ে চলেছে ধীর গতিতে! কোথায় যাচ্ছে আমরা কিছুই জানি না! এই অন্ধকারের ভিতর খান সাহেব আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাও আমরা জানি না! আমার মেজ ভাই খান সাহেবকে বললেন, সুলতান

ভাই, হাম কিধার যা রাহে হ্যাঁয় ? খান বলল, আর একটু সামনে গেলেই একটা ট্রেন স্টেশন আসবে! সেখানে তোমরা তোমাদের লাগেজ নিয়ে নেমে পড়বে! কিছুক্ষণের ভিতর করাচিগামী ট্রেন আসবে! তোমরা সেই ট্রেনে উঠে পড়বে! কেউ কারো সাথে কথা বলবে না! সবাই দূরে দূরে থাকবে। কেউ যেন বুঝতে না পারে তোমরা সব একসাথের মানুষ! করাচি পৌঁছে তোমরা নিজের নিজের বাড়ি চলে যাও! এক সপ্তাহ পরে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ! কথা বলতে বলতে আমরা ভুট্টা ক্ষেত থেকে বের হয়ে পড়লাম! দেখলাম সত্যি একটা ট্রেন স্টেশনের সন্নিকটে আমরা! খান পাঠান গাড়ি থেকে বের হয়ে পিছনের ট্রাংক খুলে দিয়ে বলল, সামান লেকে জালদি জালদি নিকাল যাও। হারামখোর কা বাচ্চা আভি ইধার আ জায়েগা! আমরা তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে বের হয়ে দেখলাম পাঠান সুলতান মাহমুদ খানের বাম হাত রক্তে ভিজে গেছে! খান ভাই আপকা হাত মে কেয়া হুয়া ? জিজ্ঞেস করলাম আমি! খান বলল, উও কুচ নেহি পুলিশ হারামখোর কা গুলিসে থোরাসা যাখাম হো গায়া! মাত ঘাবড়াও সাব ঠিক হো জায়েগা! তুম সাব ঠিক হো ? আমরা বললাম, হা খান ভাই হাম সাব ঠিক হ্যাঁয়! আচ্ছা ফির জালদিসে নিকাল যাও খোদা হাফেজ শাবক্ষা খায়ের! এই বলে সুলতান মাহমুদ খান গাড়ি ওখানেই ফেলে রেখে জনগণের ভিড়ে হারিয়ে গেল !

আমরাও আমাদের স্যুটকেস নিয়ে ট্রেন স্টেশনে চলে এলাম! আমরা একে অপরের থেকে একটু দূরত্ব বজায় রেখে, টিকেট কাউন্টারে গিয়ে করাচির টিকেট কাটলাম! তারপর আমরা সবাই সেইভাবেই একটু দূরত্ব বজায় রেখে বসে রইলাম! এবং ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম! ঘণ্টা খানেক বসে থাকতে হবে স্টেশনে! বসে বসে ভাবছি কোথা থেকে কি হয়ে গেল! কি ভেবেছিলাম আর কি হল! মনে হল আমরা নবজীবন নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাচ্ছি! এই সর্বনাশের মূল কারণ হল সেই ভুট্টা খেতের কৃষক। ওকে আমরা বোকা ভেবেছি কিন্তু ও তা নয়! আমাদের দেখে তার সন্দেহ হয়েছিল! সেই পুলিশকে ইনফরম করেছে! নইলে আমাদের সামনের ট্রাক দুটো পার হয়ে গেল অথচ আমাদের কেন আটকাল! সুলতান মাহমুদ খানের সহকারী ড্রাইভাররা যখন গাড়ি থেকে নেমে পালাল আমাদের তো আত্মা উড়ে গিয়েছিল! ভেবেছিলাম খান সাহেবও বুঝি আমাদের ছেড়ে পালাবে! কিন্তু পরে বুঝলাম, দুই সহকারী দুদিকে পালানোর কারণ! ওরা খান সাহেবের নির্দেশেই পালিয়েছে এই জন্য

যে পুলিশও ওদের পিছু নেবে। সেই সুযোগে খান সাহেব আমাদের নিয়ে পালাবে! খান সাহেবের সাহস, বুদ্ধি ও সততা আমাদের মুগ্ধ করেছে! পাঠানদের সাধারণত বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম থাকে তবে ওরা বরাবরই সাহসী শক্তিশালী এবং সৎ প্রকৃতির হয়। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে প্রয়োজনে ওরা জীবন দিতেও পিছপা হয় না! ভুট্টা ক্ষেতের ভিতর থেকে রাস্তা চিনে এই অন্ধকারে সে যে কিভাবে ট্রেন স্টেশনে আমাদের নিয়ে আসল সেটা ভাবার বিষয় বটে! তবে মনে হল, প্রতিনিয়ত তারা এই সব বিপদজনক ঝুঁকি নিয়ে খেলা করে! কারণ আমরা যখন আমাদের জীবন মরণ নিয়ে অশনি সঙ্কেত দেখতে পাচ্ছি, মৃত্যু ভয়ে আমাদের জীবন যখন প্রায় ওষ্ঠাগত, তখন আমি লক্ষ করেছি সুলতান মাহমুদ খানের ভিতর ভয় বা শঙ্কার কোনো বহিঃপ্রকাশ নেই! মনে হচ্ছিল এটা তার প্রতিদিনের খেলা! অথচ আমাদের চেয়ে তার জীবনই বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কারণ সে ড্রাইভার, সামনে বসা! সে গুলিবিদ্ধ হবার পরও তার মুখে কোনো যন্ত্রণার ছাপ বা সাড়াশব্দ দেখতে পাইনি! আমরা জিজ্ঞেস না করলে হয়তো সে বলত না তার জখমের কথা! অদ্ভুত প্রকৃতির এই পাঠান সুলতান মাহমুদ খান! তখনো ট্রেন স্টেশন এ আমরা বসে আছি ট্রেনের অপেক্ষায়! ক্লান্তিতে সারা শরীর যেন ভেঙ্গে পড়ছে! দু এক জন সিন্ধি পাঞ্জাবি মাঝে মাঝে ঘুরে ঘুরে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে! কারণ আমাদের চেহারা তো সবার থেকে আলাদা! দেশের অবস্থাও ভালো নয়! সবারই জানা হয়ে গেছে। পাকিস্তান থেকে ইস্ট পাকিস্তান আলাদা হয়ে এখন বাংলাদেশ হয়ে গেছে তাই সব বাঙালিরা যে যেভাবে পারে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে যাচ্ছে! আর বাঙালির চেহারাও ট্রেডমার্ক, অন্য সবার চেয়ে খুব সহজেই আলাদা করা যায়! পাকিস্তান সরকার প্রতিদিনই রেডিও টিভিতে বলে বেড়াচ্ছে বাঙালিদের পালিয়ে যাবার বিষয়! তাই পাকিস্তানিদের ভিতর একটা প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল! ভয়ে বুকের ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল! যদি জিজ্ঞেস করে বসে, তোমরা কারা বা কোত্থেকে এসেছ, কোথায় যাবে! কি উত্তর দেব! খান সাহেব তো এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলেনি! সে শুধু বলেছে, আমরা যেন একে অপরের সাথে কথা না বলি, দূরে দূরে থাকি! কেউ কিছু প্রশ্ন করলে কি উত্তর দেব তা বলেনি!

আমাদের সাথে আবার বড় বড় লাগেজ, চেহারায় ক্লান্তি আর আতঙ্কের ভাব–সন্দেহ করতেই পারে! মনে মনে শুধু আল্লাহকে ডাকছি আর আড়চোখে মেজ ভাই এবং অন্যদের দিকে তাকাচ্ছি! দেখি ওদেরও একই

অবস্থা! এই অবস্থায় আর বেশিক্ষণ থাকলে যে একটা অঘটন ঘটবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই! শালার ট্রেনটাও আসছে না! এই শীতের মধ্যেও শরীর ঘেমে যাচ্ছে! আশপাশের কিছু লোককে আমায় সন্দেহ হল। ভাবলাম, এরা হয়তো চোর ঠকবাজও হতে পারে। সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে কিভাবে সুটকেসটা চুরি করা যায়! এলোমেলো ভাবনায় মাথা ঘুরপাক খাচ্ছে এমন সময় বিকট শব্দ করে ট্রেন আসার সংকেত জানাল! আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে দিল! ট্রেন এসে প্লাটফর্মে দাঁড়ালে আমরা তাড়াহুড়া করে ট্রেনে গিয়ে উঠলাম আমরা সবাই একই কম্পারটমেন্টে উঠলাম। তবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসলাম যেন কেউ বুঝতে না পারে আমরা সবাই একই সাথের লোক! ট্রেনের কামরায় তেমন বেশি একটা যাত্রী ছিল না। কারণ রাত তখন ১১টার মতো বাজে ! ৪/৫ ঘন্টা তো লাগবেই করাচি পৌঁছাতে!

ট্রেন ছাড়ল! লোকাল ট্রেন। প্রতিটা স্টেশনে থামছে! একটা বিরক্তিকর ব্যাপার! ক্লান্তিতে চোখ ভেঙ্গে ঘুম আসছে কিন্তু ঘুমুতে ভয় পাচ্ছি। কারণ সিন্দ প্রদেশের বেশিরভাগ লোকই কৃষিজীবী গরিব! তাই চুরি ডাকাতি একটু বেশি এখানে! ঘুমিয়ে পড়লে শেষে দেখা যাবে সিসকে চোর আমার সুটকেস নিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়েছে! ঠুক্কুর ঠাক্কুর করতে করতে ট্রেন অবশেষে সকাল ৫টায় করাচি এসে পৌঁছল! আমরা স্টেশনে নেমে আমাদের সহযাত্রীদের কাছ থেকে সংক্ষিপ্ত বিদায় নিলাম! তারপর আমরা দু ভাই একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা কুইন্স রোড, ইন্টেলিজেন্স স্কুল সুলতানাবাদি আমাদের নিজ গৃহে এসে হাজির হলাম! সেকি প্রশান্তি! ট্যাক্সি বিদায় দিয়ে আমাদের ফ্রন্ট ইয়ার্ড এর লোহার গেটে ধাক্কাধাক্কি ডাকাডাকি! এক সেকেন্ডও যেন ধৈর্য নেই আমাদের! অনেক ডাকাডাকির পর বাবা বারান্দার গ্রিলের ফাঁক দিয়ে আমাদের দেখতে পেলেন! আমাদের দেখে তো বাবা বিস্ময়ে ভয়ে দৌড়ে এসে লোহার গেট খুলে দিলেন! আমরা ঘরে ঢুকে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম! বাবা আমাদের ক্লান্ত দেখে তখন আর কিছুই জানতে চাইলেন না! শুধু বললেন, তোমরা ভালো আছ তো?

আমরা বললাম, হুম! বাবা আমরা এখন ভালো আছি! বাবা বললেন, তোমরা এখন কিছু খেয়ে ঘুম দাও। তারপর সব শোনা যাবে! আমি আর কথা না বাড়িয়ে সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম! মেজ ভাই বাবার সাথে কথা বলছেন! আমি কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম বলতেও পারব না!

আমার ঘুম ভাঙল বেলা ১১টায়! ঘুম ভাঙতেই আমার মনে হল গত দুদিনে যা ঘটে গেল সব যেন একটা দুঃস্বপ্নের মতো! আমি হাতমুখ ধুয়ে

খাবার ঘরে গিয়ে দেখি বাবা মেজ ভাই, বড় ভাই, সবাই চা পান করছে! আমাকে দেখে বাবা কাছে ডাকলেন।

পাশে বসিয়ে বললেন, আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন! তোমরা আল্লাহতালার পরম কৃপায় সহিসালামতে ফিরে এসেছ এটাই আমার কাছে অনেক বেশি! এটা হয়তো আমার কোনো পুণ্যের ফল! তোমাদের আর পাঠাব না বাবা! তোমার মা ঠিকই বলতেন! আর কখন এসব নিয়ে চিন্তাভাবনা করব না! আমি বুঝতে পারলাম বাবা মেজ ভাইয়ের কাছ থেকে সব ঘটনা জেনে নিয়েছেন! যাক আমার আর কিছু বলতে হল না! আমি বললাম, কিন্তু বাবা ওরা যে বলল পরবর্তী সপ্তাহে সুলতান মাহমুদ খান নাকি আবার আসবে!

বাবা বললেন, আসলেও বিদায় করে দেব! আমার আর প্রয়োজন নেই এত বড় ঝুঁকি নেয়া! আমাদের ভাগ্যে যা হয় হবে! তোমার মায়ের কথামতো মরতে হয় একসাথেই মরব! এ যাত্রা তোমরা বেঁচে গেছ তোমাদের মায়ের দোয়াতে!

আমরা আর কথা বাড়ালাম না! ভাবলাম হয়তো তাই হবে। মা কখনোই চাইতেন না আমরা এভাবে পালিয়ে দেশে যাই। তবে একটা ভীষণ রকমের অভিজ্ঞতা হল, বাঙালিরা কিভাবে জীবন মরণের ঝুঁকি নিয়ে দেশে যাবার পরিকল্পনা করে! তবে সুলতান মাহমুদ খান সত্যি একজন সৎ ও ভালো মানুষ ছিল বলেই আজ আমরা জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছি!

আমার বাবার এক বন্ধু, তার ছেলের নাম ওয়াকার, আমার এক ক্লাস উপরে পড়ত! আমার সাথে তার গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল! প্রায় প্রতিদিনই সে আমাদের বাসায় আসত।

আমার গানের খুব ভক্ত ছিল! আমরা দুজন বিকেল বেলা সাগরের পারে চলে যেতাম।

সে আমাকে দেশের অনেক গল্প শোনাত। ওরা দেশ থেকে ১৯৭০-এ করাচি এসেছিল।

ওরা দুই ভাই এক বোন। ওয়াকার ভাই বোনদের মধ্যে বড়! ওর বাবা নেভি অফিসার ছিলেন। অনেক গল্প হত আর মাঝে মাঝে আমার গান। সময় খুব সুন্দর কেটে যেত।

ওরা সবাই পরিবারসহ আমাদের ৩ মাস আগে এই একই পথে যাত্রা করেছিল, তবে সুলতান মাহমুদ খান তাদের নিয়ে যায়নি! অন্য কোনো

দালালের মাধ্যমে গিয়েছিল! বাবা সুলতান মাহমুদকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ওদের কথা কিন্তু সুলতান মাহমুদ কিছুই বলতে পারেনি! সে বলল, হয়তো অন্য কোনো গ্রুপের সাথে গিয়েছে! বাবা যখন বললেন, ওরা তো বলেছিল আফগানিস্তান পৌঁছে আমাদের জানাবে! প্রায় ৩ মাস হতে চলল, ওদের কোনো খোঁজ নেই! সুলতান মাহমুদ খান তখন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, ইয়ে তো সিরফ দো দিন কা মামলা হ্যাঁয়! আভি তাক কই পাতা নেহি চালা! জারুর কই গারবার হ্যাঁয়!

হামারা ইস ধান্দে মে কুচ হারাম খোর কা বাচ্চা হ্যাঁয় যো বেইমান হায় খোঁচে! হামারা বাস চালে তো উও সাব কুত্তাকো গলিসে উরাদু! বাবা তখনি বুঝে গেলেন হয়তো ওরা এমনি কোনো খারাপ লোকের পাল্লায় পড়েছে। আল্লাহতালাই ভালো জানেন ওরা কেমন আছে নাকি মাল সামান লুট করে নিয়ে ওদের সবাইকে মেরে ফেলেছে! এরকম ঘটনা ঘটেছে আমরা জানি!

বাঙালিরা যখন পালায় তখন একেবারে আপন লোক ছাড়া তারা কাউকে জানায় না! কিন্তু ওয়াকার ভাই যাবার আগের দিন আমাকে বলেছিল, তারা আগামী কাল পালাচ্ছে পরিবারসহ! এবং আমাকে এটাও বলে গিয়েছিল, আফগানিস্তানে পৌঁছে তার প্রথম কাজ হল আমাকে ফোন করে জানানো! এবং সেই সাথে জানাবে তার পালানোর অভিজ্ঞতা! আমরাও যেন একইভাবে পালিয়ে আসতে পারি! সুলতান মাহমুদ বলল, মাত্র নাকি দুদিন লাগে কান্দাহার হোটেল পর্যন্ত পৌঁছতে! সেখানে আজ প্রায় ৩ মাসের কাছাকাছি, তাদের কোনো খোঁজখবর নেই!

এসব কথা ভাবতেই গা শিউরে ওঠে! হতভাগ্য বাঙালি উপায়-অন্তর না দেখে দেশপ্রেমে পাগল হয়ে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ছে! আমরাও তো তাই করেছিলাম!

যাইহোক, এভাবেই ৪/৫ দিন কেটে গেল। শরীর মন কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসতে লাগল।

বাবা সারাক্ষণ রেডিও কানের কাছে নিয়ে বিবিসি কিম্বা আকাশবাণী শুনতে ব্যস্ত, যদি কোনো ভালো খবর পাওয়া যায়! আমদের রুমেও একটা রেডিও ছিল। আমার বড় ভাই মেজ ভাই রুম বন্ধ করে সাউন্ড কমিয়ে রেডিও শুনতেন আর আমি পাশে বসে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম! ভাবতাম, এই বুঝি একটা ভালো খবর আসবে! মেজ ভাইয়ের আবার ধৈর্য কম।

রেডিওর এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশন ঘুরাতেই থাকে! সেজন্য বড় ভাইয়ের বকাও খায়!

মেজ ভাই, বড় ভাইকে বুঝানোর চেষ্টা করে, সে নাকি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র খুঁজে বেড়াচ্ছে!

বড় ভাই আরও ক্ষেপে গিয়ে বললেন, বোকা নাকি তুই! আকাশবাণী, ভারতের কোনো স্টেশনই ঠিকমতো পাই না! স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র তো একেবারেই নতুন, ট্র্যান্সমিশনের পাওয়ার খুব একটা বেশি না ! এই রেডিও শুধু ভারত বাংলাদেশে শোনা যায়!

মেজ ভাই আবার পলিটেকনিকের ছাত্র! সে একবার আমাদের বাড়ির ছাদে একটা এন্টিনা লাগানোর চেষ্টা করেছিল যেন রেডিওর স্টেশনগুলো একটু ভালো শোনা যায়।

বাবা তো রেগেমেগে আগুন! বললেন, কোনোদিন ভুলেও এই চিন্তা করবি না! আল্লাহ এখন পর্যন্ত আমাদের ভালো রেখেছেন! কোনোদিন যদি এই এন্টিনা কেউ দেখে আর পুলিশে খবর দিয়ে দেয়, আমাদের তবে আর রক্ষা নেই! কোনোদিন এসব চিন্তাও করবি না! আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে যা লিখেছেন তাই হবে! এইসব এন্টিনা ফেন্টিনা দেখলে ওরা ভাববে আমরা ভারতের গুপ্তচর! আর এই গুপ্তচর বৃত্তির শাস্তি মৃত্যু ছাড়া কিছুই নয়! শুধু কি তাই, ওরা যে শারীরিক অত্যাচার করবে সেটা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর! বাবার মুখে এসব শুনে আমাদের রীতিমতো গা কাঁপছিল! আমরা সবাই বাবার কাছে শপথ করলাম, আর কখনও এমন কিছু করব না যাতে কেউ আমাদের সন্দেহ করতে পারে!

বাবা বললেন, জাতিসংঘে আলাপ আলোচনা চলছে বাঙালি বিহারি বিনিময় সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। তবে কবে নাগাদ হবে তার কোনো ঠিক নেই! এভাবেই আমরা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে রইলাম! কেমন যেন আবার আমরা মুষড়ে পড়লাম! যে সব বাঙালিদের প্রিজনার ক্যাম্পে এ রাখা হয়েছে তাদের দুর্ভোগের কথা বাবা আমাদের প্রায়ই বলেন! অনেকের মৃত্যুসংবাদও আমরা পাই কিন্তু অসহায়ের মতো নীরব থাকতে হয়! এভাবেই আরও ৪/৫ দিন কেটে গেল।

হঠাৎ একদিন রাত ১০টায় ঝড়ের বেগে সেই পাঠান সুলতান মাহমুদ খান এসে হাজির! আমরা তার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কারণ বাবা তো বলেছিলেন, পাঠান সুলতান মাহমুদ খান যদিও আসে তাকে তিনি বিদায় করে দেবেন! সুতরাং আমাদের মনে আর তেমন কোনো উত্তেজনা

কাজ করছিল না! জানি একটু পরেই সুলতান মাহামুদ খান ফিরে চলে যাবে! বাবা সুলতান মাহামুদ খানকে ঘরে বসালেন। কিছুক্ষণ তারা কথা বলার পর, আমাদের কানে এল সুলতান মাহামুদ খান বলছে, আরে সাব আপ কিউ ঘাবড়াতে হো! ম্যায় সুলতান মাহামুদ খান আওর কি তারা নেহি হু! আপনে বাচ্চে কো বুলাও আওর পুছো মেরে তারাফ সে কই গাড়বার হুয়া কে নেহি! বাবা বলছেন, আরে না আমি সে কথা বলছি না। ছেলেরা তো তোমার অনেক প্রশংসা করল! আমি জানি তুমি অন্য সবার মতো না! তোমার প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে! তো ফির আপকো ডার কিস বাত কি খোঁচে! সুলতান মাহামুদ খান বলল।

বাবা বললেন, ভয় তো পাবই খান সাহেব, মা মরা ছেলে আমার! হাম ভি সামাঝতা হ্যাঁয় খোঁচে! খান একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল!

বাবা বললেন, সেই জন্যই ভয় হচ্ছে খান সাহেব! তুমি ছিলে বলেই এই যাত্রা ওরা বেঁচে গেল! নইলে যে কি হত ভাবতেই ভয় লাগে!

তবে ছেলেরা অনেক ভয় পেয়েছে, আমার মনে হয় ওরা আর এভাবে যেতে চায় না!

তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আমাকে ক্ষমা করে দিও! এই বলে বাবা উঠে দাঁড়ালেন!

বাবা ভেবেছিলেন, খান সাহেবও বুঝি উঠে দাঁড়াবে চলে যাবার জন্য! কিন্তু না খান সাহেব দাঁড়াল না! বসেই রইল!

বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, বাচ্চে কো বুলাও খোঁচে হাম থোরাসা বাত কারেগা!

বাবা আমাদের ডাকলেন! আমরা দু ভাই তো দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। রুমে ঢুকে খান সাহেবকে আমরা এক লম্বা সালাম ঠুকলাম! খান সাহেব তখন দাঁড়িয়ে আমাদের সালামের উত্তর দিয়ে করমর্দন করে হেসে বলল, কেয়া বাঙালি বাবু তুম সাব কেয়া ডার গায়ে! তারপর যা বলল, তোমরা বাঙালিরা এত ভীতু কেন বল তো! এমন কিবা হয়েছে ভয় পাবার মতো!

আমি মনে মনে বললাম, তোমাদের কাছে হয়তো এটা ছেলেখেলার মতো। তোমরা নিত্যই এই খেলা খেল! কিন্তু আমাদের কাছে তো মরণ খেলা !

তারপর খান সাহেব একটু দৃঢ়তার সাথে বলল, হামপে ভারোসা হ্যাঁয়? আমি বললাম, কিউ নেহি খান ভাই, জারুর হ্যাঁয়!

তোমার হাতের সেই জখমটা ভালো হয়েছে ? আমার মেজ ভাই প্রশ্ন করল।

আরে উও কুচ নেহি খোঁচে, মামুলি সি জাখাম ইয়ে তো হোতাহি রেহতা হ্যাঁয়!

আমি মনে মনে হাসলাম। কি ধাতু দিয়ে যে ওদের শরীর আল্লাহ বানিয়েছেন তা একমাত্র আল্লাহই জানেন !

তারপর খান সাহেব বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, এবার তোমার ছেলেদের অন্যভাবে নিয়ে যাব! যেভাবে আমি বহু বাঙালি পার করেছি! কোনো সমস্যাই হবে না ইনশাল্লাহ! সহিসালামতে পৌঁছে যাবে! কিভাবে পার করেছ ? বাবা একটু উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন !

খান সাহেব তখন আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমাদের মনে আছে তোমাদের গাড়ির সামনে দুটো লরি ট্রাক ছিল?

হ্যাঁ, ছিল তো, যে দুটো ট্রাক বর্ডার পাস করে চলে গেল! আমরা দু ভাই একসাথেই বললাম।

হুম এবার সেই ট্রাকে করেই তোমাদের নিয়ে যাব, খান সাহেব বললেন।

বাবা একটু অবাক দৃষ্টিতে খান সাহেবের দিকে তাকালেন!

খান সাহেব তখন গর্ব করে বলল, হামারা ইয়ে ট্রাক কই নেহি পাকরেগা খোঁচে!

বাবা উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, তা না হয় বুঝলাম, তোমার ট্রাক কেউ ধরবে না কিন্তু ঐ ট্রাকের ভিতরে ওরা যাবে কি করে!

উও তুম নেহি সামঝোগে খোঁচে! উও তো হামারা কাম হ্যাঁয়, খান সাহেব একটু মুচকি হেসে বলল!

বাবা নাছোড়বান্দা হয়ে বললেন, না তোমাকে বলতেই হবে, তুমি ওই ট্রাকের ভিতর ওদেরকে কিভাবে নেবে!

খান সাহেব তখন অতি সংক্ষেপে বাবাকে বুঝিয়ে বললেন, তারা ট্রাকের মেইন পাটাতন থেকে সাড়ে তিন ফিট উপরে আরেকটি কাঠের পাটাতন বসিয়ে দেয়! সেই পাটাতনের উপরে তারা মাল বোঝাই করে ত্রিপল দিয়ে সমস্ত ট্রাক ঢেকে দেয়!

দুই পাটাতনের মাঝখানে যে জায়গা থাকে সেখানে সহজেই একটা মানুষ বসে যেতে পারে! বাবা বললেন, চেকপোস্টে তোমাদের মাল চেক হয় না ?

খান সাহেব বলল, অবশ্যই হয়!

কিভাবে হয় ? তখন কি ধরা পড়ার ভয় থাকে না ? বাবা উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন!

খান সাহেব বলল, আরে নেহি নেহি তুম মাত ঘাবড়াও! ট্রাকের উপর থেকে ত্রিপল খুলে মাল দেখানো হয়!

বাবা একটু ভয়ে ভয়ে বললেন, রাস্তায় তোমাদের ট্রাক ডাকাতি হবার ভয় থাকে না! খান সাহেব এবার বুক ফুলিয়ে দাপটের সাথে বলল, কোন মা কা বেটা হায় খোঁচে যো সুলতান মাহমুদ খান সে টাক্কার লে! ইতনা হিম্মাত ওয়ালা আভি তাক পাইদা নেহি হুয়া! ফিরভি আগার কই সামনে আয়া তো গুলিসে উরা দুঙ্গা!

বাবা পরে জানতে পারলেন ওদের কাছে এবং ওদের গাড়িতে পর্যাপ্ত পরিমাণে গোলাবারুদ এবং পিস্তল বন্দুক থাকে!

খোঁচে যাবতাক হাম জিন্দা হায় সামঝো তুমহারা বেটা ভি জিন্দা হ্যাঁয়! হামারা বাপ এক যুবান ভি এক যো বোলেগা ইমান্দারিসে কারেগা! হারাম পাইসা হাম নেহি খাতা!

হাম পে ভারোসা হায় তো বাচ্চে কো দো নেহি তো ম্যায় চালতাহু খুদা হাফেজ! এই বলে পাঠান খান সাহেব উঠে দাঁড়াল চলে যাবার জন্য!

বাবা কিছুক্ষণের জন্য আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন! চোখে তার জল টলমল করছে!

কি যেন ভাবছেন গভীরভাবে! আমাদের দেয়াটা ঠিক হবে কিনা তাই হয়তো ভাবছেন!

কিছুক্ষণ নীরবে কাটল, কারও মুখে কোন কথা নেই!

হঠাৎ বাবা নীরবতা ভেঙ্গে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের কি মনে হয় ?

তোমরা কি যেতে চাও ?

সবার আগে আমি উৎফুল্ল হয়ে বলে ফেললাম, আমি যেতে চাই বাবা! সুলতান মাহমুদ অনেক ভালো মানুষ। বাবা তুমি তার উপর ভরসা করতে পার! আমার সম্মতি দেখে মেজ ভাইও মাথা ঝুলিয়ে সম্মতি জানাল!

বাবা খান সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, এবার আমার মোটেও ইচ্ছা ছিল না খান সাহেব!

তবে তোমার কথায় আর বাচ্চাদের ইচ্ছায় আমি উপরে আল্লাহ আর নিচে তোমাকে হাজির নাজির জেনে তোমার হাতে ছেলেদের ছেড়ে দিচ্ছি!

খান সাহেব উৎফুল্ল হয়ে বললেন, তুম বেফেকার রাহো খোঁচে! আরও বলল, কান্দাহার পৌঁছেই আমি তোমার ছেলেদেরকে দিয়ে তোমার কাছে ফোন করিয়ে দেব !

মুঝে সিরেফ দো দিন কা মোহোলাত দো! খান সাহেবের চোখেমুখে উচ্ছ্বাসের আলো!

যাইহোক, নির্ধারিত হল দুদিন পর খান সাহেব রাত ১০টায় এসে আমাদের দু ভাইকে আমাদের বাসা থেকে নিয়ে যাবে!

আবার শুরু হয়ে গেল কাপড় চোপড় গোছানোর কাজ। দু ভাই দুটো সুটকেস রেডি করে ফেললাম! খান সাহেব আগাম বলে দিয়েছিল, কিছু শুকনো খাবার ও ফ্রুটস সাথে নিতে কারণ প্রায় ১৪/১৫ ঘণ্টার ভ্রমণ! গায়ে ভালো করে গরম কাপড় পরে নিতে হবে। কারণ শীতের সময় আমরা যাচ্ছি। করাচির বাইরে অনেক ঠান্ডা! বিশেষ করে কান্দাহারে তো প্রচণ্ড শীত পড়ছে তখন! আমার ওষুধপথ্য আলাদা একটা ছোট ব্যাগে দিয়ে বাবা বলে দিলেন, সময়মতো যেন ওষুধ গুলো খাই আমরা। পুরাপুরি তৈরি হয়ে বসে আছি খান সাহেবের অপেক্ষায় খান সাহেব যথাসময়ে এসে হাজির হয়ে গেল ঠিক রাত ১০টায়।

আবার বিদায়ের পালা! এবার দেখলাম বাবার চোখমুখ কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে! মনে হচ্ছিল আগেরবারের চেয়ে এবার যেন বাবা বেশি ভয় পাচ্ছেন! আমাদের হারানোর ভয়! বাবার দিকে তাকিয়ে দেখলাম বাবার চোখ জলে চক চক করছে! আমি তার দিকে তাকাতেই বাবা মুখ ঘুরিয়ে অশ্রু লুকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলেন! আমি বললাম, বাবা তুমি ঠিক আছো তো! বাবা স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বললেন, আমি ঠিক আছি বাবা। এই বলে বাবা আমাদের দু ভাইকে শেষ বারের মতো বুকে জড়িয়ে ধরলেন!

তোরা সাবধানে থাকিস! আমার দোয়া সব সময় তোদের সাথে রইল! আর যদি কোনোদিন দেখা না হয় আমাকে তোরা ক্ষমা করে দিস। এই বলে বাবা এবার কেঁদেই ফেললেন! আমরা দু ভাইও বাবার সাথে সাথে কাঁদতে শুরু করে দিলাম!

খান সাহেব এই দৃশ্য দেখে বলল, রোনে কি কেয়া বাত হ্যাঁয় খোঁচে! বাবাকে উদ্দেশ্য করে খান সাহেব একটু জোর গলায় বলল, তুম কিউ ঘাবড়াতে হো খোঁচে! তুমহারা বাচ্চা তো হামারা ভি বাচ্চা! হাম পে একিন

রাক্ষ! ইনশাল্লাহ হাম সাব কো লেকে সাহিসালামাত কান্দাহার পৌঁছ জায়েঙ্গে!

বাবা উৎকণ্ঠার সাথে বলে উঠলেন, খান সাহেব, তোমার উপর আমার ভরসা আছে। তুমি অনেক ভালো মানুষ, আমার ছেলেরা বলেছে! নইলে তো ওরা তোমার সাথে দ্বিতীয় বার আর যেতে চাইত না!

তুম ভি বহুত আচ্ছা আদমি হো বাঙালি বাবু, তুমহারা বাচ্চা ভি বহুত আচ্ছা হ্যাঁয়! খান সাহেব হেসে বলল।

মনে হল খান সাহেবের কথায় বাবা কিছুটা আশ্বস্ত হলেন।

খান সাহেব নিজেই আমাদের সুটকেস দুটো হাতে নিয়ে গাড়ির পিছনের ট্রাংকে রাখলেন!

এবার আর তার সেই মারসিডিস কালো গাড়িটি নেই! এই গাড়িটিও বেশ বড়। কি যেন নাম ঠিক মনে নেই! খান সাহেবকে বললাম, খান ভাই তোমার মারসিডিস গাড়িটি কই!

খান সাহেব একটু হেসে উত্তর দিল, ওটা নাকি বডি শপে দিয়েছে বডি ঠিক করতে! পুলিশের গুলি খেয়ে গাড়ির বডি নাকি ঝাঁজরা হয়ে গেছে!

মনে মনে বললাম, আল্লাহই আমাদের রক্ষা করেছেন! সব গুলি গাড়ির উপর দিয়ে গিয়েছে। নইলে যে কি ছিল আমাদের কপালে ভাবতেই গা কাঁটা দিয়ে ওঠে!

অবশেষে আমরা দু ভাই গাড়িতে গিয়ে বসলাম। বাবা, বড় ভাই টিপু, আমার ছোট দুই ভাই বাদল এবং দুলাল– সবাই গাড়ির কাছে এসে আমাদের বিদায় জানাল।

ভাইয়েরা হাসিমুখে বিদায় জানাল কিন্তু বাবার মুখে ছিল না হাসি। বাবার চোখেমুখে ছিল দুশ্চিন্তার কালো ছায়া!

গাড়ি আমাদের বাড়ির আঙ্গিনা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল! সোজা গিয়ে উঠল বড় রাস্তায়! কুইন্স রোড পার হয়ে ধেয়ে চলল হাইওয়ের দিকে! তখন রাত প্রায় ১১ টার কাছাকাছি। রাস্তা প্রায় খালিই বলা চলে, মাঝে মাঝে দু একটি গাড়ি দেখা যায় দ্রুত গতিতে পার হয়ে যাচ্ছে! আমাদের মধ্যে কেন জানি আগের মতো সেই উত্তেজনা বা ফুর্তি কাজ করছে না। মনের মধ্যে কি যেন একটা ভয় ভয় কাজ করছে! আমরা তো এবার গাড়িতে যাব না! যেতে হবে ট্রাকের নিচে! আরও বাঙালি নাকি যাবে আমাদের সাথে ট্রাকের নিচে! আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না এতগুলো বাঙালি একসাথে ট্রাকের নিচে কিভাবে যাবে!

এই ভয়ই আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল!

দেখা যাক আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে এবার কি লিখে রেখেছে!

করাচি শহর ছেড়ে গাড়ি ছুটে চলল হাইওয়ের পানে। শহরের উজ্জ্বল বাতিগুলো ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। এক সময় দেখা গেল ঘুটঘুটে অন্ধকার আমাদের গাড়িটাকে ছেয়ে ফেলল! আমরা সহজেই বুঝতে পারলাম আমাদের গাড়িটা হাইওয়েতে উঠে গেছে। কারণ হাইওয়েতে রাস্তায় লাইট থাকে না।

অন্ধকার ভেদ করে গাড়ি দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে! কোথায় থামবে কে জানে! গাড়ির মধ্যে নীরবতা বিরাজ করছে! কারো মুখে কোনো কথা নেই! গতবার তো খান সাহেব মাঝে মাঝে কথা বলে আমাদের উৎফুল্ল করে তুলত, এবার তারাও যেন কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে। খান সাহেবের পাশে এবার একজন সহকারী। কিন্তু তারাও নিজেরা কোনো কথা বলছে না।

গাড়ির ভিতর কেমন যেন একটা থম থমে পরিবেশ বিরাজ করছে! আমি একবার ভেবেছিলাম, আমি নিজেই কিছু বলে নীরবতা ভঙ্গ করি। কিন্তু কি বলব! কি দিয়ে শুরু করব! কিছু বললে যদি খান সাহেব আমাকে ধমক দিয়ে বসে! মেজ ভাইয়ের দিকে দু তিন বার তাকিয়ে দৃষ্টি বিনিময় করলাম, যদি মেজ ভাই কিছু বলে, কিন্তু না, কোনো ফল হল না! মেজ ভাইও যেন বোবা হয়ে গেছেন! এভাবেই ঝিম মেরে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। হাইওয়ের দুপাশে ধু ধু মরুভূমি।

মরুভূমিতে মাঝে মাঝে ৩/৪ ফিট উঁচু কাঁটাযুক্ত কিছু জংলি গাছ নজরে পড়ে। এত অন্ধকারের মধ্যেও মরুভূমির সেই গাছগুলো দেখা যাচ্ছে! কেমন এক অদ্ভুত দৃশ্য! গাড়ি চলছে তো চলছেই! হঠাৎ দেখলাম গাড়ির গতি কিছুটা কমে আসছে! এক পর্যায়ে গাড়ির গতি কমতে কমতে হাইওয়ের এক পাশে এসে থেমে গেল। দেখলাম খান সাহেবের সহকারী ড্রাইভার গাড়ি থেকে দ্রুত নেমে গিয়ে গাড়ির ইঞ্জিনের হুড খুলে দিল! ভাবলাম এ আবার কি বিপত্তি শুরু হল! শেষমেশ গাড়িটা বিকল হল! খান সাহেব এতক্ষণ পর তার মুখ খুললেন, বাঙালি বাবু তুম সাব ইধার উধার যাওগে!

তারপর বলল, তোমরা গাড়ি থেকে নেমে মরুভূমির দিকে হেঁটে গিয়ে অদূরে কিছু গাছের পিছনে লুকিয়ে থাক! আমাদের একটি ট্রাক আসবে কিছুক্ষণের মধ্যেই! ট্রাক এলেই আমি আমার টর্চ লাইট তোমাদের দিকে

ফিরিয়ে দু বার জ্বালাব! তখন তোমরা চলে আসবে ট্রাকের কাছে আর তোমাদের লাগেজ গাড়ির পিছনেই রইল। ট্রাক এলেই আমি তোমাদের লাগেজ ট্রাকে তুলে দেব! আমার টর্চ লাইট না জ্বালানো পর্যন্ত তোমরা আসবে না! হাম যো বোলা সামাঝমে আয়া খোঁচে খান সাহেব বলল!

আমরা বললাম, হা বিলকুল সামাঝমে আয়া খান ভাই!

আমরা কথামতো গাড়ি থেকে নেমে উঁচু হাইওয়ে থেকে মরুভূমিতে নেমে আসলাম! তারপর হাঁটতে শুরু করলাম! অন্ধকার হলেও আবছা দেখা যাচ্ছিল জংলি গাছগুলো! হাইওয়ে থেকে প্রায় কোয়ার্টার মাইল হবে গাছগুলো। মরুভূমির উঁচু নিচু অসমতল পথ, ছোট বড় পাথর বিছানো, সেই সাথে ছোট ছোট কাঁটাযুক্ত গাছ। প্যান্টের সাথে বিঁধে যাচ্ছিল কাঁটাগুলো! পা ফেলতে খুব কষ্ট হচ্ছিল! অন্ধকারে পাথরের উপর চলতে পা মচকে যাবার ভয় ছিল!

তারপর আবার মেজ ভাই বলল, সাবধানে পা ফেলিস, এই সব মরুভূমিতে বিষধর সাপ থাকে! এই কথা শুনে ভয়ে আমার তো আর পা চলে না!

কিরে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? মেজ ভাই বলল!

আমি বললাম, কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না ভাই! সাপ দেখে হাঁটব কিভাবে!

মেজ ভাই বিরক্ত হয়ে বলল, এই জন্য দাঁড়িয়ে থাকবি! আল্লাহ ভরসা, হেঁটে আয়!

আমি মায়ের শিখানো যত দোয়া দরুদ ছিল তা পড়তে পড়তে হাঁটতে লাগলাম! আরও একটা সমস্যা ছিল, হাঁটতে গিয়ে কিছু উড়ন্ত পোকামাকড় আমার নাকেমুখে এসে পড়ছিল।

ভাইকে আর সে কথা বলিনি। সাপের উপর পা না পড়লেই হল! গাছগুলোর ছোট ছোট ডালপালা পায়ে লাগলেই আমি চমকে উঠি, এই বুঝি সাপ আমার পায়ে প্যাঁচ খেল!

অবশেষে সেই গাছের পিছনে এসে পৌঁছলাম! দু ভাই গাছের আড়ালে লুকিয়ে বসে রইলাম!

তাও কি আর শান্তিতে বসে থাকা যায়! বুন বুন করে গান গেয়ে মশার দল যেন উৎসবে মেতে উঠেছে! এক মুহূর্তের জন্যেও আমাদের স্বস্তি দিচ্ছে না! সারাক্ষণ নড়াচড়ার মধ্যেই আছি! এত সবের মধ্যেও হাঁ করে তাকিয়ে আছি হাইওয়ের দিকে,কখন টর্চ লাইট জ্বলে উঠবে! কতক্ষণ যে বসে

থাকতে হয় কে জানে! বসে থাকা তো কোনো সমস্যা নয় কিন্তু পোকা মাকড় মশা আর সাপের ভয় আমাদের ভীত সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল! মনে মনে আল্লাহকে ডাকছিলাম! এমন সময় মেজ ভাই বলে উঠল, কিরে তুই ঠিক আছিস তো! আমি বললাম, হুম ঠিকই ছিলাম কিন্তু এই শালার মশার উৎপাতে তো অস্থির করে তুলেছে! ভাই বলল, হুম কি আর করা, উপায় নাই ভাই, একটু কষ্ট করে থাক! তোর জন্য আমার খারাপ লাগছে! আমি বললাম, কেন ভাই ?

তুই তো অসুস্থ! তোকে নিয়ে না আবার বিপদ হয়! তুই কেন যে আসলি!

আমি ভাবলাম মেজ ভাই আমাকে না আবার বাসায় রেখে আসে! সেই ভয়ে আমি উৎফুল্ল হয়ে বললাম, না না ভাই, আমি সম্পূর্ণ ভালো আছি! আমাকে নিয়ে আপনি একটুও ভাববেন না! এই যা একটু মশার উপদ্রব! আপনার গায়ে মশা পড়ছে না ? কি যে বলিস, মশার জ্বালায় বসে থাকা দায়!

তীর্থের কাকের মতো হাইওয়ের দিকে তাকিয়ে আছি! কত গাড়ি আমাদের গাড়িটাকে পাস করে চলে যাচ্ছে কিন্তু কোনো গাড়ি থামছে না! আর কতক্ষণ যে এভাবে বসে থাকব! রেডিয়াম দেয়া হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম প্রায় ৫০ মিনিট হয়ে গেছে আমরা এভাবেই মশার কামড় খাচ্ছি! প্রমাদ গুনতে শুরু করলাম!

এমন সময় দেখলাম, দূর থেকে একটা বিশাল বড় লরি ট্রাক বিম লাইট জ্বালিয়ে আসছিল! আমাদের গাড়িটার কাছে আসতেই ট্রাকের গতি কমে গেল! আমাদের মনে একটা আশার সঞ্চার হল! সত্যিই তো ট্রাকটা গতি কমিয়ে ধীরে ধীরে আমাদের গাড়িটার পিছনে এসে থেমে গেল! মেজ ভাই বললেন, এখুনি মনে হয় টর্চ জ্বলে উঠবে! তৈরি থাকিস ! আমরা দু ভাই তৈরি হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম লাইট জ্বলার অপেক্ষায়! একটা মিনিটও যেন পার হচ্ছে না!

কিন্তু একি টর্চের কোনো সিগনালই আসছে না! এমন সময় দেখলাম, ট্রাকটা আমাদের গাড়িকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে! তবে কি ওরা আমাদের কথা ভুলে গেছে! আমার মনে হচ্ছিল, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলি, আমাদের নিয়ে যাও, আমরা এখানে বসে আছি!!

আমার রীতিমতো কান্না পাচ্ছিল! আমি ভাইকে বললাম, এটা কি হল ভাই! আমাদের কথা কি ওরা বেমালুম ভুলে গেছে!

আরে থাম তো, দেখিস না আমাদের গাড়িটা ওখানেই আছে একই অবস্থায়!

আছে তো দেখতে পাচ্ছি! কিন্তু ট্রাকটা তো চলে গেল!

চুপ করে বসে থাক, খান সাহেব তো গাড়ির সাথে আছে।

কই আমি তো দেখতে পাচ্ছি না!

আমি দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার, গাড়ির চারদিকে হাঁটাহাঁটি করছে!

আমি একটু ভালো করে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। তাই তো কেউ যেন আমাদের হুড উঠানো গাড়ির চারপাশে হাঁটাহাঁটি করছে!

মেজ ভাইকে বললাম, আমিও একটু একটু দেখতে পাচ্ছি কে যেন ওখানে হাঁটাহাঁটি করছে!

আরে সেই তো আমাদের খান সাহেব। চিনতে পারছিস না বোকা?

আমার ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল!

তাহলে ট্রাকটা আমাদের নিল না কেন ?

নিশ্চয় কোনো কারণ আছে, ভাই বলল।

আমি বললাম, কি এমন কারণ থাকতে পারে ?

আমি কি করে বলব গাধা কোথাকার! মেজ ভাই এবার একটু ক্ষেপে গেল।

আমি আর কথা বাড়ালাম না! চুপচাপ বসে অন্ধকারে মশা তাড়াতে লাগলাম। আমি যেন অনেকটা ভেঙ্গে পড়লাম! ভাগ্যে কি আছে কে জানে!

মেজ ভাই কিছুক্ষণ পর একটু সান্ত্বনার স্বরে বললেন, কিরে মন খারাপ নাকি?

আমি কিছুই বললাম না, চুপ করেই থাকলাম।

মেজ ভাই আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, মন খারাপ করিস না!

নিশ্চয় আমাদের কোনো একটা ব্যবস্থা হবে! গতবার তোর মনে নেই আমাদের গাড়ির সামনে দুটো ট্রাক ছিল? ট্রাক দুটো কি সুন্দর বর্ডার পাস করে চলে গেল আমাদের চোখের সামনে দিয়ে আর আমরা খেলাম ধরা!

মনে আছে ভাই। তার মানে আরও একটি ট্রাক আসবে আমাদের নিতে? আমি উৎফুল্ল হয়ে ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম।

অবশ্যই আসবে। একটু অপক্ষা কর!

আমি আবার অপেক্ষার জাল বুনতে শুরু করলাম। কখন শেষ হবে এই অপেক্ষার পালা!

অন্ধকার, পোকামাকড় মশা আর সাপের ভয় আমাকে প্রায় অর্ধমৃত করে রেখেছে!

১০/১৫ মিনিট যেতে না যেতেই দেখলাম, দূর থেকে দুটো হেড লাইটক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে আসছে!

মহান আল্লাহ তালার নিকট হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করতে লাগলাম, হে আল্লাহ আমাদের রক্ষা কর। ওই হেডলাইট দুটো যেন আমাদের বহনকারী ট্রাক হয়! এই অন্ধকারে আর বসে থাকতে পারছি না! জীবন প্রায় ওষ্ঠাগত!

মহান আল্লাহ্ আমাদের ফরিয়াদ মনে হয় শুনেছেন। দেখলাম হেডলাইট দুটো উজ্জ্বল হতে হতে আমাদের গাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে! এবং ফাইনালি আমাদের গাড়ির পিছনে এসে থেমে গেছে!

তোকে বলিনি একটা ব্যবস্থা হবেই! ওই দেখ আরেকটি ট্রাক এসে থেমেছে! মেজ ভাই খুশিতে অনেকটা উত্তেজিত হয়ে বললেন তাই তো দেখছি, আমিও খুশিতে উল্লসিত হয়ে উত্তর দিলাম, নে নে এবার তৈরি হয়ে নে, টর্চ লাইট এখুনি জ্বলে উঠবে।

আমি রেডি ভাই। তুমি রেডি তো! মুখে যেন এখন কথার ফুলঝুরি।

হুম আমিও রেডি, ভাই বললেন।

ট্র্যাক থেকে দুজন ড্রাইভার নেমে আমাদের গাড়িটার দিকে হেঁটে আসল।

খান সাহেবের সাথে কি যেন কথা বলল! সবাই তখন একসাথে ট্র্যাকটার পিছনে গেল।

একজন আমাদের গাড়ি থেকে আমাদের লাগেজগুলো বহন করে নিয়ে ট্রাকে লোড করছে।

এমন সময় দেখলাম টর্চের তীব্র আলো আমাদের দিকে দুবার জ্বলে উঠল! একটু পরে আবার জ্বলে উঠল দুবার!

আমরা অন্ধকারে পাথরের আঘাত আর মরুভূমির কাঁটাগাছের আঁচড় উপেক্ষা করে ছুটে চললাম ট্রাকের দিকে! আমি চলার পথে দু একবার পড়েও গিয়েছিলাম! ভাই আমাকে টেনে তুলেছিল।

পাগলের মতো ছুটছিস কেন! পড়ে গিয়ে ব্যথা পাবি তো! ভাই আমাকে ধমক দিয়ে সাবধান করে দিলেন।

আরে আমাদের না নিয়ে ওই ট্র্যাক যাবে না! তুই আস্তে ধীরে সাবধানে চল! মেজ ভাই আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন।

অবশেষে আমরা হাইওয়ের কাছাকাছি এসে পৌঁছলাম। হাইওয়ের উপরে উঠে ট্রাকের কাছে এসে দাঁড়ালাম! খান ভাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাদেরকে ওই ট্রাকটা দেখিয়ে বলল, তুম ইস লরি মে উঠ যাও খোঁচে!

আরও বলল, তুমহারা সামান ইস লরি মে উঠা দিয়া গ্যায়া! মানে আমাদের লাগেজ এই ট্রাকে তারা উঠিয়ে দিয়েছে। এই বলে আমাদের ট্রাকের পিছনের দিকে নিয়ে গেল। ট্রাকটা দেখে বোঝা গেল প্রচুর মাল লোড করা হয়েছে। যার ফলে ট্রাকটা প্রায় ১৭/১৮ ফিট উঁচু হয়ে গিয়েছে। সব মাল মোটা ত্রিপল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে! ট্রাকের পিছনে যেখান দিয়ে মাল উঠানো হয় সেখানে গিয়ে ত্রিপল খানিকটা তুলে আমাদের জন্য ছোট্ট একটা দরজা আবিষ্কার করা হল!

একজন মানুষ গুটিশুটি মেরে ঢুকতে পারে। আমি প্রথমত একটু অবাক হয়ে গেলাম।

আমার মাথায় কিছুতেই আসছিল না, কিভাবে আমি ঢুকব! ভিতরে অন্ধকার!

কিছুই দেখা যাচ্ছে না! আমি খান ভাইকে বললাম, হাম কেয়সে আন্দার জায়েগা!

কুচ নাজার নেহি আতা! খান সাহেব বলল, আরে ডারনেকা কই বাত নেহি খোঁচে আন্দার মে আওর ভি বাঙালি বাবু হায়।

এই বলে খান সাহেব আমার মেজ ভাইকে প্রথমে দুহাত দিয়ে তুলে সেই ছোট্ট দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। তারপর আমাকেও দুহাত দিয়ে তুলে সেই ছোট্ট দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল। মনে হল একটা মুরগির খোপের ভিতর আমাদের ঢুকিয়ে দিল। ভিতরে ঢুকে দেখি ঘুটঘুটে অন্ধকার! আমি একটু মাথা উঁচু করে বসতে গিয়ে দেখি মাথার উপরে কাঠের পাটাতন ঠেকল! তার মানে বসে থাকা ছাড়া উপায় নাই। খান সাহেব বলেছিল আরও বাঙালি নাকি ভিতরে আছে। কিন্তু কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। আমার মেজ ভাইকেও দেখতে পাচ্ছি না। আমি আস্তে করে নিম্ন গলায় মেজ ভাইকে ডাকলাম, মেজ ভাই তুমি কোথায়? হঠাৎ করে অনুভব করলাম একটা হাত আমার কাঁধে স্পর্শ করল, এই তো আমি তোর পাশেই আছি!

খান সাহেব না বলেছিল আরও বাঙালি আছে ভিতরে!

বলার সাথে সাথেই শুনলাম ৪/৫ জন প্রায় একসাথেই বলে উঠল, এই তো ভাই আমরাও আছি! অন্ধকার তো তাই দেখতে পাচ্ছেন না!

দেখলাম একজন পেনসিল টর্চ জ্বেলে জানান দিল আমরাও আছি! সেই অল্প আলোতে দেখলাম, ভিতরে অনেক লোক। তার মধ্যে কিছু মহিলা ও দুধের শিশুও রয়েছে! সবাইকে দেখে মনে একটু সাহস সঞ্চার হল! ট্রাকের ভিতরে আমরা সবাই প্রায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে আছি!

এতগুলো বাঙালি আমরা একসাথে বসে বাংলাদেশে পাড়ি জমাচ্ছি ভাবতে বেশ ভালোই লাগছিল। ট্রাক ছাড়ার আগে ড্রাইভারের একজন সহকারী সেই ছোট দরজার ভিতর মাথা ঢুকিয়ে আমাদের লক্ষ করে বলল, বাঙালি বাবু যাব গাড়ি চালতা রাহেগা তুম সাব বাতে কার সেকতা। লেকিন ড্রাইভার যাব হর্ন বাজায়েগা তুম সাব খামুশ হো! যানা! হর্ন বাজানো মানে আমরা কোনো চেক পোস্টে এসেছি! সুতরাং আমাদের সবাইকে চুপ করে থাকতে হবে।

যতক্ষণ না ট্রাক আবার চলতে শুরু করে। তাই ড্রাইভার আমাদের এই বিষয়ে বার বার সতর্ক করে দিয়েছে। কারণ চেকপোস্টের পুলিশ যদি একবার আমাদের কারো শব্দ শুনতে পায় ভিতর থেকে তাহলেই সব শেষ! সুতরাং আমরাও সকলে সেইভাবে প্রস্তুত হয়ে রইলাম।

কথা শেষ করে সহকারী ড্রাইভার ঘটাং করে ভীষণ শব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর ত্রিপল দিয়ে ঢেকে দিল সমগ্র ট্রাক! কারো বোঝার উপায় নাই এই বিশাল মালবাহী ট্রাকের ভিতর আমরা ৩৮ জন বাঙালি মালের সাথে মিশে একাকার হয়ে আছি!

ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার! মাঝে মাঝে মায়ের কোলে শিশুর মৃদু কান্নার শব্দ। আর কারো মুখে কোনো শব্দ নাই। ভীষণ একটা ঝাঁকি দিয়ে ট্রাক চলতে শুরু করল! ঝাঁকি খেয়ে বুঝতে পারলাম, এই ভ্রমণ তেমন সুখের হবে না।

ট্রাক ছুটে চলেছে ঘড় ঘড় করে সিন্দের চামান বর্ডারের দিকে। যেখান থেকে আমরা ধাওয়া খেয়ে ফিরে এসেছিলাম! কি সুন্দর ছিল সেই ভ্রমণ! ভাগ্যে আমাদের সইল না। এখন মনে হচ্ছে একটা মুরগির খাঁচায় কতগুলো মুরগি আমরা! কি আছে ভাগ্যে আল্লাহই জানেন।

কতক্ষণই বা থাকতে হবে এই অবস্থায়!

ট্রাকের ভিতর আমরা অনেকেই সাথে করে আঙ্গুর আপেল কমলা নিয়ে এসেছিলাম। কারণ ড্রাইভার বলে দিয়েছিল, ট্রাক কোথাও থামবে না। শুধু

চেক পোস্টে থামবে কিছুক্ষণের জন্য। সেখানে নামা তো দূরের কথা, কথা বলাও যাবে না। ড্রাইভার আরও বলে দিয়েছিল, ১৪ থেকে ১৬ ঘণ্টা লাগতে পারে! যদি চেকপোস্ট অথবা বর্ডারে কোনো ঝামেলা না হয়, তাহলে নির্ধারিত সময়ের একটু আগেও যেতে পারি। এত সময় এইখানে এইভাবে বসে থাকতে হবে।

সাথে পানি এনেছি কিন্তু অল্প অল্প করে তা পান করছি সবাই কারণ এখানে তো কোনো বাথরুমের ব্যবস্থা নেই! এ কারণে শক্ত খাবারও সহসা খাচ্ছি না। দু একটা আঙ্গুর মুখে দেই এই যা। ৪/৫ ঘণ্টা এইভাবেই চলল। বিরামহীন ট্রাক ছুটে চলেছে! মনে হল সকাল হয়েছে। ট্রাকের কোনো একটা ক্ষুদ্র ফাঁক দিয়ে ক্ষীণ একটু আলোর রোশনি ভিতরে ঢুকেছে। গভীর অন্ধকারে ক্ষীণ আলো যেন বিশাল আকারে দেখা দেয়।

আমরা সবাই নির্বাক হয়ে বসে আছি। আর মাঝে মাঝে ঝাঁকুনিতে মাথা ট্রাকের উপরের পাটাতনের সাথে আঘাত খাচ্ছে! এভাবে বেশিক্ষণ বসে থাকা যাচ্ছে না। তাই অনেকেই পরিধানের কোট খুলে মাথার উপরে বেঁধে নিচ্ছে যেন মাথাটা রক্ষা করা যায়। সবার দেখাদেখি আমিও আমার কোট খুলে মাথায় বেঁধে নিলাম।

এরই মধ্যে আবার আরেক সমস্যা দেখা দিল, ৪/৫ ঘণ্টা এ অবস্থায় আসন করে বসে থাকায় পায়ের জয়েন্টগুলো ব্যথায় টন টন করছে! পা একটু সোজা করলে হয়তো ভালো লাগত। কিন্তু তার কোনো উপায় নেই। কারণ আমরা সবাই অনেকটা গা ঘেঁষে বসে আছি।

পা সোজা করলেই আরেক জনের গায়ে গিয়ে স্পর্শ করবে। কেউ মুখ খুলে কিছু বলছে না ভদ্রতার খাতিরে। কিন্তু কাঁহাতক এই যন্ত্রণা ভোগ করা যায়! যখন যন্ত্রনা চরমে পৌঁছে গেল তখন আমাদের ভিতর থেকে কেউ একজন বলে উঠল, ভাইরে আর তো পারছি না, পা-টা একটু সোজা না করলেই নয়! সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই একসাথে ভদ্রলোকের কথায় সমর্থন জানালেন।

অন্য আরেক জন বলে উঠল, এই ট্রাকের ভিতর আমরা যারা আছি সবাই এখন ভাই বোনের মতো, একই পরিবারের ভেবে নিতে হবে, কারণ জরুরি অবস্থায় যা হয়! সুতরাং পা সোজা করলে অনেকের গায়ে স্পর্শ করবে। আমরা আশা করি কিছু মনে করব না। কার গায়ে কার পা স্পর্শ করবে আমরা কিছুই জানি না, কারণ এই গভীর অন্ধকারে আমরা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

সবাই এক কথায় মেনে নিল।

বলা মাত্রই অনুভব করলাম একজনের পা আমার কোলের উপর এসে পড়ল! আমি আমার পা সোজা করার উপক্রম করতেই মনে পড়ল আমার সুমুখেই তো সেই ভদ্র মহিলা বাচ্চা কোলে নিয়ে বসে আছেন। আমি প্রথমত একটু ইতস্তত বোধ করলাম। মুখটা সামনে নিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম মহিলা আমার পা থেকে কত দূরে অবস্থান করছেন! কিছুই দেখা গেল না। শুধু আঁচ করতে পারলাম, তার সাথে আরও ২/৩ টি অল্প বয়সের বাচ্চা রয়েছে। ওরা মাঝে মাঝে কথা বলছে মায়ের সাথে। আমি যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে বিসমিল্লাহ বলে পা দুটো আস্তে আস্তে সোজা করে ফেললাম। অনুভব করলাম আমার পা দুটো কারো পায়ের উপর গিয়ে পড়েছে।

নাহ, কেউ কোনো প্রতিবাদ করল না। আশ্বস্ত হলাম। পা দুটো সোজা করে যে কি শান্তি পেলাম বলা বাহুল্য এই শান্তিও বেশিক্ষণ আমাদের সইল না! ট্রাকের গতি ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সেই সাথে ঝাঁকুনিও! বাচ্চাগুলো মাঝে মাঝে কেঁদে উঠছে, বাচ্চাদের বাবার হাতে পেন্সিল টর্চ ছিল, মাঝে মাঝে সেটা জ্বেলে স্ত্রীর কোলে দুধের শিশুটিকে দেখে নিচ্ছে এবং অন্য বাচ্চাদের সান্ত্বনা দিচ্ছে।

ট্রাকের ঝাঁকুনির প্রবলতা এতই বেশি ছিল যে আমরা আমাদের জায়গায় ঠিকমতো বসে থাকতে পারছিলাম না। সুতরাং আমাদের অজান্তেই আমরা কখন যে স্থানচ্যুত হয়ে কোথায় কার উপরে শুয়ে পড়েছি তা আমরা নিজেরাও বুঝতে পারলাম না। ভীষণ এলোমেলো অবস্থা।

কিন্তু কারো মুখে কোনো শব্দ নেই। পরিস্থিতি সবাই আমরা মেনে নিয়েছি। কারো কোনো অভিযোগ নেই!

আমার মেজ ভাই হয়তো আমাকে নিয়ে বেশি ভাবছিলেন। তাই তিনি আমার নাম ধরে উচ্চ কণ্ঠে ডাকলেন, বাবুল তুই ঠিক আছিস তো! উল্লেখ্য, আমার ডাক নাম বাবুল।

ইচ্ছা হচ্ছিল না উত্তর দিতে। কিন্তু উত্তর না দিলে ভাই হয়তো আরও দুশ্চিন্তায় ভুগবেন। তাই উত্তর দিলাম।

জী এখনো ঠিক আছি।

আমি অবাক হলাম, মনে হল মেজ ভাইয়ের কণ্ঠটা ট্রাকের অন্য প্রান্ত থেকে এল। কিন্তু মেজ ভাইতো আমার পাশেই ছিল।

ধুত! এসব ভেবে কোনো লাভ নেই। আমিই বা কোন প্রান্তে পড়ে আছি তার ঠিক নাই।

ট্রাকের গতি যেন আগের চেয়ে অনেক বেশি, তাই ঝাঁকুনিও বেশি। শব্দও অনেক বেশি।

কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। তবুও আমরা থেমে নাই, চলছি তো চলছি।

এভাবে আরও প্রায় ৩/৪ ঘন্টা কেটে গেল।

সাথে করে আমি যে সব আঙ্গুর আপেল কমলা নিয়ে এসেছিলাম সেগুলো যে কোথায় সিটকে পড়েছে কে যানে। পানির ছোট বোতলগুলোও যে কোথায় কে জানে! তৃষ্ণায় মনে হচ্ছে কণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ! অন্ধকারে হাতড়িয়ে খোঁজার চেষ্টা করছি, কোথাও কিছু পাওয়া যায় কিনা।

হঠাৎ মনে হল আমার পিঠের নিচে যেন কি! হাত দিয়ে দেখলাম আমার কিম্বা অন্য কারো আঙ্গুর কমলা আমার পিঠের নিচে চাপা পড়ে চেপ্টা হয়ে আছে। ওখান থেকেই কিছু একটা নিয়ে গলা ভেজানোর চেষ্টা করলাম! আমাদের শরীর অনবরত ঝাঁকুনির উপরই আছে।

আমি ভাবছিলাম, আমাদেরই এত কষ্ট হচ্ছে। মহিলা, তার দুধের শিশু এবং আরও দুটো তিনটে অল্প বয়সের বাচ্চা– ওদের অবস্থা কি কে জানে! এত কষ্টের মধ্যেও আমার ওদের জন্য খুব খারাপ লাগছিল! বাচ্চারা কান্নাকাটি করছে আর বলছে, বাবা বাসায় কখন যাব!

বাবা নিষ্ফল আশা দিয়ে বলছে, এই তো বাবা চলে আসছি, আর একটু আর একটু! আমার বারে বারে মনে পড়ছিল, প্রথম বার যদি দুর্ঘটনা না ঘটত তবে কি আরামেই না চলে আসতাম। নিজের ভাগ্যের উপর রাগ হচ্ছিল! আমাদের ভিতর থেকেই একজন বলছিল, মনে হল মহিলার স্বামী, ভাই কেউ একজন ড্রাইভারকে বলুন না ট্রাকটা একটু আস্তে চালাতে।

এখানে আবার দেখা গেল কিছু লোকের দ্বিমত! কেউ কেউ ভাবছে, ট্রাকটা দ্রুত চললে আমাদের একটু কষ্ট হলেও আমরা তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারব।

আবার কেউ বলছে, ট্রাকের ভিতর মহিলা শিশু ছোট বাচ্চাও রয়েছে। ওদের দিকেও আমাদের দেখা উচিত! আপনারাই তো বলেছেন এই ট্রাকের ভিতর আমরা সবাই এক পরিবারের মতো। আর কারো মুখে কথা নেই। ট্রাক তার নিজস্ব গতিতে ছুটে চলছে।

হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো ট্রাকটা প্রচণ্ড একটা ঝাঁকি খেয়ে মনে হল কোনো খাদে পড়ে গেল! কিন্তু না ট্রাকের গতি কিছুটা কমে আবারো চলতে শুরু করেছে। এবার ঝাঁকুনি পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ! মনে হল ট্রাকটা রাস্তা থেকে নেমে একটা ভাঙ্গা রাস্তায় প্রবেশ করেছে! আর ট্রাকের ভিতর মহিলার কান্না বাচ্চাদের কান্না, শিশুটির কান্না। শুধু তাই নয়, বড়রাও অনেকে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠেছে! ভয়ে চিৎকার করছে। আমরা ট্রাকের ভিতর সবাই লণ্ড ভণ্ড হয়ে গেছি! মায়ের কোল থেকে শিশুটি সিটকে পড়ে গিয়েছিল! মা চিৎকার করে বলছে, আমার বাচ্চাটা কোথায়, আমার বাচ্চাটা কোথায়?

হঠাৎ মহিলার আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। মহিলার স্বামী তার পেন্সিল টর্চ জ্বালিয়ে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, ভাইরে আমার বউ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে। কথা বলছে না, কারো কাছে একটু পানি আছে? একজন একটা ছোট বোতলে অর্ধেকেরও কম পানি তার দিকে বাড়িয়ে দিল! মহিলার স্বামী অল্প অল্প করে তার মুখে পানি ঢেলে দিচ্ছিল।

একজন একটা চেপ্টা হয়ে যাওয়া কমলা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এটার রস একটু মুখে দেন। এর মধ্যে শিশুটি কেঁদে উঠল। একজন বলল, এই যে ভাই, বাচ্চাটা তো এখানে আমার পাশেই পড়ে ছিল! দুহাত দিয়ে শিশুটিকে ধরে ভদ্রলোকের হাতে তুলে দিলেন। এই সময় কিছু সংখ্যক বাঙালি ভাই সজোরে চিৎকার করে ড্রাইভারের পিছনের কাঠের ওয়ালটাতে হাত দিয়ে আঘাত করে বলছে, ড্রাইভার গাড়ি রোকো গাড়ি রোকো! নাহ ওদের কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না! এবার আমরা সবাই মিলে একসাথে চেঁচাতে লাগলাম, গাড়ি রোকো ড্রাইভার গাড়ি রোকো! দেখলাম ড্রাইভারের ছিটের পিছনে ছোট্ট একটা চৌকোনা খোপের মতো জানালা। ওটা খুলে একজন জিজ্ঞেস করল, কেয়া হুয়া আমরা প্রায় সবাই একসাথে চেঁচিয়ে উঠলাম, গাড়ি রোকো।

গাড়ি নেহি রোকেগা খোঁচে বাচ্চা আউর বাচ্চা কা মা বিমার হো গিয়া! গাড়ি রোকো।

তবুও ওরা গাড়ি থামাল না! ওরা বলল, গাড়ি নাকি বর্ডার এর কাছে চলে এসেছে!

গাড়ি থামালে বিপদ হতে পারে! সবাইকে চুপ থাকতে বলেছে!

কিন্তু চুপ করার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। ড্রাইভার সিট থেকে আবারো চিৎকার করে বলতে লাগল, খামুশ রাহো সাব, খামুশ হো যাও!

হাম বর্ডারকে কারিব আ গায়ে। বড়রা চুপ হয়ে গেলেও বাচ্চাদের কান্না থামানো যাচ্ছে না। ট্রাকের গতি আরও কমিয়ে দেয়া হল। কিন্তু বাচ্চারা তো কেঁদেই চলেছে। ড্রাইভার আবারো চিৎকার করে বলল, আরে ভাই কিউ নেহি সামাঝতে হো খুদা কেলিয়ে চুপ হো যাও। নেহিতো হাম সাব পাকড়া জায়েঙ্গে। এবার আমরা সবাই ভয় পেয়ে গেলাম। বাচ্চার বাবা-মাকে আমরা নরম সুরে বললাম, ভাইজান বাচ্চাদের কান্না না থামলে যে আমরা বিপদে পড়ে যাব। প্লিজ বাচ্চাদের কান্না থামান। স্বামী স্ত্রী দুজনেই চেষ্টার কোনো ত্রুটি করছেন না। কিন্তু কান্না একেবারে থামানো যাচ্ছে না।

অনেক চেষ্টা করেও তারা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছেন। এক পর্যায়ে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, ভাইজান আপনাদের জন্য কি আমরা শেষে সবাই ধরা পড়ে যাব? বাচ্চার বাবা-মায়ের কণ্ঠে আকুতির সুর, কি করব ভাই কোনো মতেই যে থামানো যাচ্ছে না। আপনি বুঝতে পারছেন না ড্রাইভার কেন গাড়ির গতি কমিয়ে দিয়েছে। আমরা একেবারেই বর্ডারের সন্নিকটে এসে গেছি। যেভাবেই হোক কান্না থামাতে হবে। নইলে আমাদের সবার সমূহ বিপদ। আমাদের ভিতর থেকে একজন বলে উঠল।

ক্ষীণ অন্ধকারে দেখতে পেলাম, বাচ্চাদের বাবা মা বাচ্চাদের মুখ হাত দিয়ে চেপে রেখে কান্নার শব্দ থামানোর চেষ্টা করছে। তবে কোলের শিশুটির কান্না কিছুতেই থামানো যাচ্ছিল না। আমরা সবাই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের শেষ রক্ষা বুঝি আর হল না। অবস্থা বেগতিক দেখে কেউ কেউ উম্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠল, কি হল ভাই কান্না থামাতে পারছেন না কেন, ভাইরে চেষ্টা তো করছি, কোলের শিশুটির খুবই খারাপ অবস্থা কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না।

কি যে করি ভেবে পাচ্ছি না! কান্না জড়িত কণ্ঠে শিশুটির মা বললেন।

ফিডার মুখে দিয়ে রাখেন না কেন!

চেষ্টা তো করছি ভাই, কিন্তু কিছুতেই ফিডার মুখে নিতে চাইছে না। বার বার বমি করছে।

কি বলেন আপনি! এই বাচ্চার জন্য কি আমরা সবাই মরব!

আমিও তো বুঝি, ভাইরে একটু সময় দেন থেমে যাবে ইনশাল্লাহ!

সবাই চেঁচিয়ে উঠল, কিসের সময়! গাড়ি তো বর্ডারে এসে গেল!

এমন সময় বিকট শব্দে ড্রাইভার ২/৩ বার হর্ন বাজিয়ে জানান দিল, আমরা বর্ডারে পৌঁছে গেছি। আমরা ট্রাকের ভিতর সবাই কেঁপে উঠলাম।

আমাদের বুঝি আর রক্ষা নেই। শিশুটির কান্না কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না। সবার দৃষ্টি শিশুটির মায়ের উপর। মায়েরও চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই।

এমন সময় আমাদের ভিতর থেকে একজন ক্ষিপ্ত হয়ে বলে ফেলল, আপনার বাচ্চার জন্য আমরা সবাই মরতে রাজি নই। বাচ্চা থামাতে না পারলে মুখ গলা চেপে ধরুন!

এই কথা শুনে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল শিশুটির মা।

না ভাই প্লিজ এ কথা বলবেন না, শিশুটি আমার মারা যাবে।

আরে ধুত্তুরি আপনার শিশু! একটা শিশুর জন্য কি আমরা ৩৫ জন আত্মাহুতি দেব!

সে কি এক ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল ট্রাকের ভিতর। আমার বুক ফেটে কান্না পাচ্ছিল শিশুটির বাবা মায়ের কথা ভেবে। তাদের কি কান্না আকুতি মিনতি সবার কাছে তাদের শিশুটিকে বাঁচানোর জন্য। আমার খুবই ইচ্ছা হচ্ছিল কিছু একটা শিশুটির বাবা মায়ের পক্ষে বলতে। কিন্তু দেখলাম, ট্রাকের বেশির ভাগ লোক তাদের উপর ক্ষেপে রয়েছে। তাই কিছু বলতে সাহস পেলাম না।

ট্রাক বর্ডারে এসে থেমে গেল। ট্রাকের ড্রাইভার ঘন ঘন হর্ন বাজিয়ে যাচ্ছিল যেন ট্রাকের কোনো শব্দ বাইরে না শোনা যায়।

আল্লাহর কি অশেষ রহমত, এরি মধ্যে শিশুটির কান্নাও থেমে গিয়েছিল। নাকি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল কে জানে, আমরা ভিতরে বসে বাইরের কথোপকথন শুনতে পাচ্ছিলাম পুলিশ আর ড্রাইভারের মধ্যে। পুলিশ আমাদের ড্রাইভারকে বলল ট্রাকের এক পাশের ত্রিপল খুলে ফেলতে।

পরিষ্কার শুনতে পেলাম আমাদের ড্রাইভার সুলতান মাহমুদ পুলিশের সাথে হেসে হেসে কথা বলছে।

আরে সাহাব আপসে তো হার রোজ মোলাকাত হোতে রেহতা হ্যাঁয়, দেখনে কা কেয়া বাত হ্যাঁয়।

একহি মাল সামান হি তো হ্যাঁয় চালো ইয়ার ফিরভি দেখ লো।

পুলিশ বলল, ইয়ে তো হামারা নোকরি হ্যাঁয় খোঁচে দেখনা পাড়তা হ্যাঁয়।

কই বাত নেহি খোঁচে দেখো দেখো, সুলতান মাহমুদ বলল।

আমাদের এক পাশের ত্রিপল টান দিয়ে খুলে ফেলল। শব্দ পেলাম পুলিশ তার হাতের লাঠি দিয়ে মালের ভিতর নাড়া চাড়া দিয়ে কিছুক্ষণ

দেখল। আর এদিকে তো আমাদের ধড়ে প্রাণ যায় যায় অবস্থা। সবাই মিলে আল্লাহকে ডাকছি। এমন সময় আমাদের ট্রাকের পিছন থেকে আরেকটি ট্রাক এসে বারে বারে হর্ন বাজাচ্ছিল।

পুলিশ রেগে গিয়ে সেই ট্রাক ড্রাইভারকে একটা বাজে গালি দিয়ে বলল, ইতনা জালদি কিস বাতকি হ্যাঁয়, গাড়ি উধার রোকো।

তারপর পুলিশ আমাদের ড্রাইভারকে বলল, চালো খান সাব তুম নিকাল যাও। আমাদের যেন ঘাম দিয়ে জর ছাড়ল। সবাই এক সাথে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। পরে বুঝলাম পিছনের ট্রাকটাও আমাদের ড্রাইভার সুলতান মাহমুদেরই ছিল।

আমাদের ট্রাকটা যেন তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেয় সেই জন্যই অযথাই হর্ন বাজাচ্ছিল। আমাদের ড্রাইভারের দুজন সহকারী ঝটপট করে আমাদের ট্রাকটা আবার আগের মতো করে ঢেকে দিল। তারপর আবার ছুটতে শুরু করল। শুরু হল আবার ঝাঁকুনি আর ঝাঁকুনি।

বর্ডারের রাস্তাগুলো হাইওয়ের রাস্তার মতো তেমন মসৃণ নয়। তাই অসহ্য ঝাঁকুনি।

হিসাব করে দেখলাম প্রায় ১৩ ঘণ্টা আমরা এই নরকের মধ্যে বন্দি হয়ে আছি। এত কষ্টের মধ্যেও একটা আনন্দ আমাদের মাঝে কাজ করছিল, সেটা হল, অনেক ভয় থাকা সত্ত্বেও আমরা বিনা ঝামেলায় বর্ডার পাস করে এসেছি কিন্তু ট্রাকের ঝাঁকুনি আগের চেয়ে অনেক বেশি। কারণ রাস্তাঘাট সব সমান নয়, কিছু উঁচু নিচু আর ভাঙ্গা।

কিছু দূর যেতে না যেতেই আমি অনুভব করলাম, আমার গায়ে এসে গরম পানি পড়ছে অনেকটা ঝরনার মতো। আমার গায়ে শার্টের এক অংশ ভিজে গেল প্রথমত আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। যখন একটা উদ্ভট গন্ধ আমার নাকে এসে পৌঁছল তখনই বুঝতে পারলাম এটা কারো প্রশ্রাব। এই অন্ধকারে ভীষণ ঝাঁকুনিতে কে কার উপর প্রশ্রাব করে দিচ্ছে কে জানে।

কাকেই বা দোষ দেব। আমার নিজেরও তো প্রশ্রাবের বেগে তলপেট ফেটে যাচ্ছিল। আর কতক্ষণই বা এভাবে থাকতে হবে আর কতক্ষণই বা প্রশ্রাবের বেগ ধরে রাখা যাবে।

উপায়ন্তর না দেখে আমিও তাই করলাম আমার বন্ধুবর যা করেছেন। এভাবে অনেকেই একি কাজে লিপ্ত হয়েছেন। আর বাচ্চারা তো মনে হয় উভয় কর্ম একসাথে করেছে। নইলে যে অসহনীয় দুর্গন্ধ ট্রাকের ভিতর সৃষ্টি

হয়েছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। অন্ধকারে কিছুই দেখার বা বোঝার উপায় নাই, শুধু দুর্গন্ধ ছাড়া।

আমার কয়েকবারই বমির উপক্রম হয়েছিল। অনেক কষ্টে তা সম্বরণ করে রেখেছিলাম। কারো মুখে কোনো সাড়াশব্দ নেই বা কারো কোনো আপত্তিও নেই। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সবাই নিরুপায় অসহায়। একটাই সান্ত্বনা সবার মনে, আমরা বিপদ কাটিয়ে এসেছি। আর ভয় নেই। সুতরাং এই কষ্ট আমরা মাথা পেতে নিয়েছি। আর হয়তো ৩/৪ ঘণ্টা তারপরেই স্বাধীন বাংলাদেশের আস্বাদ আমরা পাব। এই আশায় সব দুঃখ কষ্ট আমরা মাথা পেতে নিয়েছি।

তাই কারো মুখে কোনো কথা নেই। কার গায়ে কে ছিটকে পড়েছি বা কে আমার গায়ে এসে পড়েছে কিম্বা আমি কার গায়ে গিয়ে পড়ে যাচ্ছি, সরি বলারও কোনো অবকাশ নেই আমাদের। আমরা রীতিমতো আলুভর্তা হয়ে যাচ্ছি ট্রাকের ভিতরে। একটা দিক ভালোই হয়েছে সবার জন্য। সেটা হল চারিদিকে শুধু অন্ধকার। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। দেখতে পেলে হয়তো দুঃখের সীমা থাকত না। কার কত কষ্ট সইবার ধৈর্য আছে তারই হয়তো পরীক্ষা চলছে এই অন্ধকার দুর্গন্ধময় ট্রাকের ভিতর। তবে পরোয়ারদিগার আমাদের একটা কঠিন পরীক্ষাই নিয়েছেন বটে।

একটু পরপরই বাচ্চাগুলোর কান্না শুনতে পাচ্ছিলাম! মায়ের আহাজারি শুনতে পাচ্ছিলাম! ছোট্ট দুধের শিশুটির কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না!

মা কান্না করে বলছিল, ভাইরা, গাড়িটা কি একটু থামানো যায়! আমার বাচ্চাটার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, একটু নড়াচড়া ও করছে না! মহিলার স্বামীও আকুতি মিনতি করে বলছিল, ভাইরে দুধের শিশুটিকে বুঝি আর বাঁচানো যাবে না! দয়া করে গাড়িটা একটু থামানোর চেষ্টা করেন!

তখন আমরা সবাই মিলে চিৎকার করতে শুরু করলাম, গাড়ি রোকো গাড়ি রোকো! কেউ কেউ দুহাত দিয়ে ড্রাইভারের পিছনের স্টিলের দেয়ালটাকে জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগল! অনেক ক্ষণ চেঁচামেচির পর আমরা সবাই পরিশ্রান্ত হয়ে গেলাম কিন্তু ড্রাইভার বাবাজির কোনো সাড়াশব্দ নেই! গাড়ি আগের মতোই ছুটে চলেছে উঁচু নিচু রাস্তা দিয়ে, প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে। আমরা বড়রাই ঠিক মতো বসে থাকতে পারছি না। এদিক সেদিক সিটকে পড়ছি। বাচ্চা ছেলে আর তার মায়ের যে কি অবস্থা হচ্ছে, তা চোখে দেখতে পাচ্ছি না বলেই উপলব্ধি করতে পারছি না।

হঠাৎ ড্রাইভারের কণ্ঠ শুনতে পেলাম, ড্রাইভার উচ্চ কণ্ঠে বলল, তোমরা ভয় পেও না !

কিছু ডাকাত আমাদের পিছু নিয়েছে! আমরা সব সামলে নেব। তবে এখুনি গাড়ি থামানো যাবে না! একটু অপেক্ষা কর।

এই কথা শুনে আমরা তো ভয়ে অস্থির! এক বিপদ থেকে রেহাই পেয়ে আল্লাহ আবার এ কোন বিপদে আমাদের ফেলছেন!

গাড়ির ভিতরে সবাই আমরা পড়তে লাগলাম, লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ জোয়ালিমিন!

এমন সময় শুনতে পেলাম, ঠা ঠা ঠা শব্দে বন্দুকের গুলির আওয়াজ! বেশ কয়েক রাউন্ড!

মনে হল শব্দগুলো দূর থেকে ভেসে আসছে। এর কিছুক্ষণ পর আবার সেই গুলির শব্দ দূর থেকে ভেসে এল, ঠা ঠা ঠা ঠা ...!

আমরা উপলব্ধি করলাম, দু তিনটি গুলি আমাদের ট্রাকের গায়ে এসে বিদ্ধ হচ্ছে!

ট্রাকের ভিতর থেকে একজন বলে উঠলেন, ভাইয়েরা, সবাই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন!

আর আল্লাহকে ডাকুন! আমরা ভীষণ বিপদে আছি।

আমি মনে মনে বললাম, শুয়ে পড়ব কি ? শুয়েই তো আছি! তবে চিৎ হোয়ে! তাড়াতাড়ি পাশ ফিরে উপুড় হয়ে গেলাম!

সহসা আমাদের সবার কর্ণ বিদীর্ণ করে বিকট শব্দে গর্জে উঠল আমাদের ড্রাইভার সহকারীদের রাইফেল, গুডুম গুডুম। ৪/৫ রাউন্ড গুলি হল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। আবার গর্জে উঠল আমাদের ড্রাইভারের রাইফেল গুডুম গুডুম!

আরও ৩/৪ রাউন্ড গুলি বর্ষণ হল ওদের উপর! এইভাবে কিছুক্ষণ গুলি বিনিময়ের পর চুপ হয়ে গেল দু পক্ষই। আমরা তো আল্লাহ রসুলের নাম জপ করেই যাচ্ছি।

এভাবেই বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। মনে হল এবারের মতো আমরা বিপদমুক্ত হলাম।

আমি জানি এই সব পথে ডাকাতরা ওত পেতে থাকে! ডাকাতদের জানা আছে, এই সব ট্রাকে বাঙালি পাচার হয়! আর বাঙালিরা অনেক টাকা পয়সা সোনা দানা নিয়ে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আফগানিস্তানে যায়!

যারা অসাধু লোক তাদের সাথে এইসব ডাকাতদের যোগসূত্র থাকে। তারা ইচ্ছে করেই ট্রাক থামিয়ে দিয়ে বলে, আমরা ধরা পড়ে গেছি ডাকাতের হাতে। তোমাদের যার কাছে যা আছে তাই দিয়ে দাও! নইলে ওরা তোমাদের মেরে ফেলবে!

এইভাবে নিরীহ বাঙালির কাছ থেকে ডাকাতরা সর্বস্ব কেড়ে নেয়! যা আমরা করাচি থেকেই শুনে এসেছি। তবুও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাঙালিরা পা বাড়ায় দেশে যাবার আশায়।

তবে আমাদের ড্রাইভার সৎ এবং ইমানদার! আল্লাহর বিশেষ রহমতে এমন লোক পেয়েছি।

আমরা যখন বুঝতে পারলাম আমরা বিপদমুক্ত, তখন কি আনন্দ ট্রাকের ভিতর!

আনন্দ উল্লাসে সবার মুখে তখন কত কথা! কিন্তু সেই মহিলা আর তার স্বামীর মুখে কোনো কথা নেই! শুনতে পাচ্ছিলাম, মহিলাটি গুমরে গুমরে তখনও কাঁদছে আর বলছে, আল্লাহ তুমি আমার বাচ্চাটাকে বাঁচাও। একজন বলে উঠল, আমরা মনে হয় প্রায় চলে এসেছি! ইনশাল্লাহ আপনার বাচ্চার কিছু হবে না। আমরা সবাই দোয়া করছি। কি বলেন ভায়েরা ? আমরা সবাই একসাথে সমস্বরে বলে উঠলাম, অবশ্যই দোয়া করছি বোন! আল্লাহ সবার সহায় হন!

আমরা এতটাই পরিশ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত আর ক্ষুধার্ত যে কথা বলারও যেন শক্তি হারিয়ে ফেলেছি।

তাই ট্রাকের ভিতর আবার নীরবতা! শুধু ট্রাকের বিচ্ছিরি শব্দ আর ঝাঁকুনি। শরীরের হাড় মাংস যেন সব আলাদা হয়ে যাচ্ছে। গায়ের কাপড় চোপড় সব ভিজে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে!

এই দুর্গন্ধ শুরুতে অসহনীয় ছিল কিন্তু এখন আর তেমন কোনো অনুভূতি নেই! এখন মনে হচ্ছে জান বাঁচানো দায়! আরও কিছুক্ষণ এভাবে চলতে থাকলে নির্ঘাত কেউ না কেউ পটল তুলবে! আমার যে অবস্থা আমিই হয়তো সবার আগে পটল তুলব! মেজ ভাইয়ের কি অবস্থা কে জানে! আমি আছি কি নেই সেই খবর নেয়ারও বুঝি তার শক্তি নেই। সবাই ইয়া নাবছি।

১৫/১৬ ঘণ্টা যাবৎ অন্ধকারের মধ্যে বসবাস করছি। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। মাঝে মধ্যে মনে হয় অন্ধ হয়ে গেছি। আদৌ আর দেখতে পারব কি? এক ফুট সমুখে আমার হাতখানাও দেখতে পারছি না! এমন মোটা পুরু ত্রিপল দিয়ে আমাদের ঢেকে দেয়া হয়েছে যে বাহিরের এক বিন্দু

আলো ভিতরে ঢুকতে পারছে না। তবে এত কষ্টের মধ্যেও একটু সান্ত্বনা যে আমরা পাকিস্তানের বর্ডার পার হয়ে এসেছি। ডাকাতদের আক্রমণ থেকে রেহাই পেয়েছি! হয়তো আর কিছুক্ষণ এভাবে থাকতে হবে, তার পরেই আলোর মুখ দেখব।

এমন সময় অনুভব করলাম, ট্রাকের গতি ক্রমশ কমে আসছে। হয়তো গন্তব্যস্থলে চলে এসেছি।

ট্রাকের গতি কমতে কমতে এক সময় থেমে গেল! কিন্তু কারো মধ্যে তখনও কোনো প্রতিক্রিয়া অনুভব করলাম না! সবাই যেন অসাড় হয়ে শুয়ে রয়েছে! হয়তো পরবর্তী ঝাঁকুনির প্রতীক্ষায় রয়েছে। প্রায় পাঁচ মিনিট হয়ে গেল। ট্রাক থেমেই রইল। এক সময় ট্রাকের ইঞ্জিনও থেমে গেল। তখন অনেকেই একটু নড়েচড়ে উঠল। মনে হল সমস্ত পৃথিবী যেন স্তব্ধ হয়ে থেমে গেছে। কানে ঝি ঝি পোকা ডাকছে। কিন্তু সবাই তখনও স্তব্ধ। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

এভাবেই কেটে গেল আরও ৩/৪ মিনিট। আমি শুনতে পেলাম ড্রাইভার ও তার সহকারীদের কথোপকথন। আমি আলোর অপেক্ষায় রইলাম।

হঠাৎ দেখি এক ঝলক আলো এসে আমার চোখ দুটোকে ঝলসে দিয়ে গেল। আমি তাকাতে পারলাম না। দু হাতে চোখ দুটো চেপে ধরলাম। এমন সময় শুনতে পেলাম খান সাহেবের কণ্ঠস্বর, বাঙালি বাবু বাহার নিকলো। হাম কান্দাহার পৌঁছ গায়া।

তারপর আরও বলল, এই জায়গার নাম গুলিস্তান। এখানে একটা সরোবর ঝর্ণা আছে।

এখানে তোমরা মুখ হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নাও। এবং কাপড় চোপড় বদলে নাও।

তারপর খানা খেয়ে নাও।

কিন্তু তখনও কারো নড়াচড়ার কোনো শক্তি নেই!

আমি আস্তে আস্তে দু হাত সরিয়ে আলোর দিকে তাকাতে চেষ্টা করলাম। মনে হল চোখে একটা প্রেশার অনুভব করলাম। কারো নড়া চড়া না দেখে খান সাহেবের লোকরা আমাদের টেনে টেনে বার করল।

আমি প্রথমে মাটিতে পা রেখে দাঁড়াতে পারলাম না। মাটিতে বসে পড়লাম! শুধু আমি নই, অনেকেরই একই অবস্থা হল। আমাদের স্বাভাবিক হতে প্রায় ১৫ মিনিট সময় লেগে গেল। এই প্রথম আমরা সবাই সবাইকে দেখলাম। কারোর দিকে তাকানো যায় না।

আমরা সবাই যেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিধ্বস্ত হয়ে এসেছি। আমাদের সাথের সেই মহিলা ও তার দুধের শিশুর কথা মনেই ছিল না।

আমি সামনে সরোবর আর ঝর্ণা দেখে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। শুধু আমি নই, সবাইকে দেখলাম সেই সরোবরে নেমে স্নান করতে। আমার শরীরে যত কাপড় ছিল সব খুলে পানিতে ভাসিয়ে দিলাম। শুধু একটা পাজামা পরা ছিল আমার। পানিতে ইচ্ছেমতো সব ধুয়ে নিলাম। যেন সব ক্লান্তি একেবারে ধুয়েমুছে নিরসন করে দিলাম।

খান সাহেবের সহকারিরা আমাদের লাগেজ সব বের করে দিল। যার যার লাগেজ আমরা খুঁজে নিলাম। মেজ ভাইকে দেখলাম আমার পাশে এসে দাঁড়াল।

তোর তো কোনো খোঁজ নেয়া হয়নি। তুই ঠিক আছিস তো! ভাই উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল।

হুম! ঠিক আছি। আপনি কেমন আছেন ?

আমিও ঠিক আছি। তবে ভেবেছিলাম, এই যাত্রায় বুঝি তুই শেষ হয়ে যাবি।

আমিও তাই ভেবেছিলাম, তবে আল্লাহই রক্ষা করেছেন।

আমাদের সবাইকেই আল্লাহ রক্ষা করেছেন।

আচ্ছা তোর কাছেই একটা মহিলা বসে ছিল বাচ্চা কোলে নিয়ে। অনেক কান্নাকাটি করছিল! সে কেমন আছে জানিস?

না জানি না, তবে খোঁজ নেয়া উচিত।

হুম, আমার খুব খারাপ লাগছিল তার বাচ্চার জন্য।

আমারও খুব খারাপ লাগছিল।

এরই মধ্যে মেজ ভাই লাগেজ খুলে তার এবং আমার কাপড় নিয়ে এলেন। কাপড় পরে এদিক সেদিক খাবারের সন্ধান করতে লাগলাম আমি আর মেজ ভাই।

প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছে, তাই না ভাই! এই ১৬/১৭ ঘণ্টা তো কিছুই খাওয়া হয়নি! তারপর আবার এই ঝাঁকুনি। নাড়িভুঁড়ি সুদ্ধ হজম হয়ে গেছে। এখন মুখে কিছু না দিলেই নয়।

আমরা একটু অদূরে হেঁটে যেতেই দেখি একটা মাটির ঘর। সেখানে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কমলা লেবু বিক্রি করছে। আমাদের পকেটে কিছু পাকিস্তানি রুপি ছিল। সেই রুপি দিয়ে আমরা ৪/৫ টা কমলা লেবু কিনে দু'ভাই খেলাম। কিন্তু তাতে আমাদের পেট মোটেই ভরল না। এমন সময়

দেখলাম, মাটির ঘরে বাঙালিরা গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। সেখানে এক আফগান পরিবার বিশাল আকারের তান্দুরি রুটি বানাচ্ছে। একটি রুটি ৬/৭ জন এক সাথে পেট পুরে খেতে পারবে। আমরা সবাই মিলে সেই রুটি মহা আনন্দে বুভুক্ষের মতো খেলাম। এইভাবে আরও অনেক রুটি বানানো হল সবার জন্য।

খাওয়া শেষে আমার হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল সেই মহিলা আর তার শিশুটির কথা। এখন পর্যন্ত কোথাও তাকে দেখতে পেলাম না। একটু অবাকই হলাম। আমরা সবাই স্বার্থপরের মতো তাকে ফেলে খেয়ে নিলাম! খুব অপরাধী মনে হচ্ছিল নিজেকে। কিন্তু কিই বা আর করার ছিল। সবাই ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। কথায় বলে না, আপনি বাঁচলে বাবার নাম! সেই অবস্থাই হয়েছিল আমাদের। পেট ভরে গিয়েছে, এখন তার কথা মনে পড়ছে! কি নির্মম বাস্তবতা! কিরে, কি ভাবছিস? মেজ ভাই জিজ্ঞেস করল।

সেই মহিলাটির কথা এবং তার শিশু বাচ্চাটির কথা। ও হ্যাঁ, তাদের দেখছি না তো!

আমাদের খোঁজ নেয়া দরকার, মেজ ভাই!

অবশ্যই দরকার, যে করুণ অবস্থা ছিল তার।

তবে চলুন ওই দিকটা দেখে আসি।

আমরা বেরিয়ে পড়লাম বাইরের দিকে। কিছু দূর যেতেই আমাদের ড্রাইভার খান সাহেবকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, খান ভাই আপকো মালুম হায় হামারা সাথ যো আউরাত আয়া উও কিধার হ্যাঁয় ?

উস মাই কো তো হাম ডক্টর সাব কা পাস ভেজা দিয়া।

আউর উসকা বাচ্চা ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মা বেটি দোনোকো হি এক সাথ লে গায়া।

তাবিয়াত কেয়সা থা ?

দোনো হি বেহোশ থি! মাত ঘাবড়াও খোঁচে সাব ঠিক হো যায়েগা!

শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বিশেষ করে দুধের শিশুটির কথা ভেবে আরও খারাপ লাগছিল। মন থেকেই দোয়া করলাম, আল্লাহ যেন তাদের সুস্থ করে দেন।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। পশ্চিম আকাশটা রক্তিম আকার ধারণ করেছে! একটু পরেই আবার অন্ধকার হয়ে যাবে! এই এলাকাটা সম্পূর্ণ গ্রাম অঞ্চল। মাটির ঘরে টিম টিম করে মাটির পিদিম জ্বলছিল। জানতে পারলাম, এখান

থেকে আমাদের কান্দাহার শহরে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে একটি হোটেলে আমরা উঠব। তারপর কি হবে এখনো জানি না।

এমন সময় দেখলাম, একটা জীর্ণ শীর্ণ মিনি বাস এসে মাটির ঘরের সামনে থামল। খান সাহেব সবাইকে সেই বাসে উঠতে বলল। আমরা সবাই আমাদের লাগেজ নিয়ে বাসে উঠলাম। বাস ছুটে চলল কান্দাহারের দিকে।

দু পাশে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখলাম শুধু ধু ধু মরুভূমি আর পাহাড়। আঁকা বাঁকা উঁচু-নিচু রাস্তা। বাসের গতি ছিল কম কিন্তু শব্দ ছিল বেশি। বাসের ঝাঁকুনি আমাদের পিছনের কথা মনে করিয়ে দিল। মনে পড়তেই যেন গা শিউরে উঠল! একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতো মনে হতে লাগল। প্রায় দু ঘণ্টার মতো লাগল কান্দাহার শহরে পৌঁছাতে।

বাস গিয়ে থামল একটা হোটেলের সম্মুখে। তিন তলা বিশিষ্ট হোটেলটি দেখতে মন্দ ছিল না।

আমরা একে একে সবাই নেমে পড়লাম বাস থেকে। আমাদের নিয়ে যাওয়া হল লবিতে।

সেখানে খান সাহেব আমাদের বলল, আপাতত এই হোটেলে আমরা থাকব দু'দিন। তারপর এখান থেকে আরেকটি বাস ভাড়া করে আমাদের কাবুলের পথে যাত্রা করতে হবে।

খান সাহেব মেজ ভাইয়ের কাছে এসে বলল, তোমরা দু'ভাই আমার সাথে এসো।

খান সাহেব আমাদের দুজনকে হোটেল ফ্রন্ট ডেস্কের সামনে নিয়ে গেল। সেখানে একটা ফোন দেখিয়ে বলল, দুই রুপিয়া দিলে আমরা আমাদের বাবার সাথে কথা বলতে পারব।

মেজ ভাই আমাদের বাসার নাম্বার এবং দুই রুপিয়া খান সাহেবকে দিল। খান সাহেব নিজে ফোনে ডায়াল করে লাইন লাগিয়ে দিল করাচিতে।

হ্যালো কউন হায়! লাতিফ সাব ? অন্য প্রান্ত থেকে হয়তো বাবাই ফোন ধরেছিলেন। খান সাহেব বলল, হ্যাঁ খোঁচে ম্যায় সুলতান মাহমুদ খান বোলতা হাঁয় কান্দাহার সে। ইয়ে লো তুমহারা বেটাসে বাত কারো।

এই বলে ফোনটা খান সাহেব মেজ ভাইয়ের হাতে ধরিয়ে দিল।

হ্যালো আব্বা!

বাবা তোমরা ঠিকমতো পউছেস!

জী আব্বা আমরা ঠিকমতোই পউছে গেছি।

পথে কোনো অসুবিধা হয়নি তো ?

না তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি, তবে কষ্টের সীমা ছিল না।

তোমার অসুস্থ ছোট ভাইটি ঠিক আছে তো ?

জী সেও ঠিক আছে।

ফোনটা ওকে দাও।

মেজ ভাই ফোনটা আমাকে দিল। বাবার কণ্ঠ ছিল কান্নাবিজড়িত।

বাবা তুই কেমন আছিস ?

আমি ভালোই আছি আব্বা। তুমি মোটেও ভেব না, বিপদের সময় পার হয়ে এসেছি।

বাবা কিছুক্ষণ কথা বলতে পারছিলেন না।

আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, কান্নায় বাবার কণ্ঠ ভার হয়ে আসছিল। ঠিকমতো কথা বলতে পারছিলেন না।

আমি অনেকটা সান্ত্বনার ভাষায় বাবাকে বোঝাতে চেষ্টা করে বললাম, আব্বা তুমি কাঁদছ কেন! আমরা তো ভালো আছি। রাস্তায় যা একটু কষ্ট হয়েছে। এখন আমরা একটা বড় হোটেলে উঠেছি। ২/১ দিনের মধ্যে আমরা কাবুল রওয়ানা দেব এখান থেকে।

বাবা তোর শরীর ভালো আছে?

জী আব্বা একদম ভালো আছে। তুমি দুশ্চিন্তা কর না।

তোদের সাথে যে টাকা দিয়েছি সেগুলো ঠিক আছে তো ?

সব ঠিক আছে।

টাকা পয়সা সাবধানে রাখিস এবং প্রয়োজন বোধে খরচ করবি।

জী আব্বা

তোদের সাথে আরও বাঙালি আছে ?

হুম, আমরা ৩৮ জন বাঙালি একসাথে আছি।

এই কথা শুনে বাবা যেন একটু আশ্বস্ত হলেন। অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে বললেন, বাবা তোদের জন্য আমার অনেক দোয়া রইল। যেখানেই জাস ফোনে যোগাযোগ রাখবি।

অবশ্যই রাখব আব্বা।

এমন সময় হঠাৎ ফোনের লাইনটা কেটে গেল। আমি হ্যালো হ্যালো করেই যাচ্ছি। কিন্তু ওপাশ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। তখন সামনে থেকে একটি লোক বলল, তুমহারা টাইম খাতাম হো গায়া! আউর ভি আদমি তুমহারা পিছে লাইন পে হ্যাঁয়। আমি পিছন ফিরে দেখি আরও

৪/৫ জন আমার পিছনে ফোন করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। আমি বিব্রত বোধ করলাম। ফোনটা আমি পিছনের এক বাঙালির হাতে তুলে দিয়ে চলে আসলাম। মনটা খারাপ হয়ে গেল কিছুক্ষণে জন্য। বাবার কথা মনে পড়তে লাগল। তার কান্না ভেজা কণ্ঠ যেন আমার কানে বারে বারে বাজতে লাগল।

আমি মেজ ভাইকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না! পরে দেখলাম মেজ ভাই ফ্রন্ট ডেস্কে রুমের জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। আমি একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম। এমন সময় দেখলাম, একজন বাঙালি কাগজ কলম নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি ভাই কোনো সমস্যা!

না কোনো সমস্যা নয়। আমরা যারা পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছি একসাথে একই ট্রাকের ভিতর তাদের একটা লিস্ট করছি।

কারণ জানতে পারি কি ?

অবশ্যই।

তাহলে কারণটা দয়া করে বলুন না!

ভদ্রলোক বললেন, আমরা ক'জন একসাথে আছি তার একটা লিস্ট থাকা ভালো নয় কি ?

তা তো অবশ্যই ভালো।

তা ছাড়া আগামী কাল বা পরশু আমরা কাবুলের পথে যাত্রা করব।

ও আচ্ছা।

একটা বাস ভাড়া করতে হবে কান্দাহার টু কাবুল। তিনি আরও বললেন, আমরা অলরেডি কাবুলে ভারতীয় দূতাবাসের সাথে কথা বলেছি।

তাই নাকি, কি কথা হল!

তারাই বললেন, একটা বাস রেন্ট করে কাবুলে তাদের দূতাবাসের সামনে চলে আসতে।

তারপর!

তারপর বাকি সব ব্যবস্থা তারাই করবেন।

বাহ, বেশ ভালো তো!

তা আপনি কি একাই এসেছেন ?

না, আমার বড় ভাই আমার সাথে আছেন।

তাহলে কাইন্ডলি আপনার নাম এবং আপনার বড় ভাইয়ের নামটা বলুন, আমি লিখে নিই। আমি আমাদের নাম দিয়ে বললাম, ভাই রাতে আমাদের খাবারের কি কোনো ব্যবস্থা আছে? ভদ্রলোক কিছু বলার আগেই

দেখি মেজ ভাই এসে হাজির। ভাই বললেন, তুই কিছু ভাবিস না। আমি সব ব্যবস্থা করে এসেছি।

কি ব্যবস্থা করলেন ?

আমাদের রুমের চাবি এবং খাবারের কুপন।

ওহ, তাহলে তো ভালোই হল।

কিন্তু ওরা যে খাবারের মেনু দিয়েছে তা তো তোর জন্য মোটেই ঠিক নয়!

কেন ?

ঝাল কাবাব রুটি আর কারি।

কাবাবের নাম শুনে আমার ক্ষুধা যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল। কাবাব আমার প্রিয় খাবারের একটি। আমি অস্থির হয়ে বলে ফেললাম, তাতে কি হয়েছে?

আরে না না, বাবা বলে দিয়েছেন ঝাল জাতীয় খাবার তোর জন্য বিষের মতো।

আর মাংসও খেতে পারবি না।

তাহলে কি খাব?

দেখি তোর জন্য সালাদ কিম্বা সবজি ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই দীর্ঘদিন ধরে ঝাল তেল ছাড়া শুধু সিদ্ধ করা সবজি আর ফলমূল খেতে খেতে আমি তিক্ত হয়ে গিয়েছিলাম! আমি আর কিছুই বললাম না। সোজা চলে আসলাম রুমে। অনেক ক্লান্ত ছিলাম। ঘুমে চোখ ভেঙ্গে আসছিল। কোনো রকম কাপড় বদলে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। কতক্ষণ ঘুমালাম জানি না।

মেজ ভায়ের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল। দেখি সত্যি সে কোথেকে যেন শাক সবজি ফলমূল নিয়ে এসেছে আমার জন্য। দেখে বিরক্তি ধরে গেল আমার। মুখে কিছুই বললাম না। কারণ ভাই এত কষ্ট করে এইসব নিয়ে এসেছেন। তার উপর বাবার ও নির্দেশ রয়েছে। চুপচাপ মুখ বুজে খেয়ে নিলাম।

ভাই অবশ্য আমার সামনে কাবাব খাননি। আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর খেয়েছেন।

পরদিন সকালে একটু বেলা করেই ঘুম থেকে উঠলাম। মেজ ভাই আমার আগেই উঠে বাথরুমে শাওয়ার নিচ্ছেন। আমাদের রুমটা তৃতীয় তালায় ছিল। তাই বেশ আলো ঝলমলে। আমি জানালার পর্দাটা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। অনুন্নত শহর। রাস্তাঘাট তেমন ভালো নয়।

দোকান পাট রয়েছে কিছু। উঁচু বিল্ডিং সহসা চোখে পড়ে না। আমি জানালা দিয়ে আমাদের হোটেলের লবির সম্মুখটা দেখতে পাচ্ছিলাম। রাস্তার মোড়ে বেশ বড় একটা সাইন বোর্ড দেখতে পেলাম। তাতে বড় করে লেখা রয়েছে, হোটেল পামির। বুঝতে বেগ পেতে হল না আমাদের হোটেলেরই সাইনবোর্ড এটা। রাস্তায় গাড়ি চলাচল আছে তবে ভালো কোনো গাড়ি চোখে পড়েনি। সাইকেলের ব্যবহার বেশ চোখে পড়ার মতো। মাঝে মাঝে মটর সাইকেল দেখা যায়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পান সিগারেটের দোকান ছাড়াও ছোট ছোট চায়ের দোকান আর রেস্তোরা দেখা যায়। বিদেশি লোক শহরে তেমন একটা দেখা যায়নি। হোটেলে কিছু বিদেশি লোক ছাড়া বাইরে নব্বই শতাংশ লোকই স্থানীয় কাবুলি অথবা পাঠান, কিছু পাঞ্জাবিও আছে মনে হল। এক এক জন ইয়া লম্বা চওড়া, মাথায় পাগড়ি, সবার পোশাক-আশাক একি ধরনের। ঢোলাঢালা কোর্তা-পাজামা। বোঝা গেল ওরা পান খেতে খুব ভালোবাসে।

পানের দোকানে আনাগোনা আর অনেকেরই মুখে পান। পান চিবুচ্ছে আর যেখানে সেখানে পানের পিক ফেলছে। এটা অবশ্য করাচিতেও দেখেছি। তবে কান্দাহারের তুলনায় করাচি শহর অনেক পরিষ্কার আর উন্নত।

কিরে কখন উঠলি! মেজ ভাই শাওয়ার শেষ করে কখন যে আমার পিছনে এসে দাঁড়ালেন আমি তা বুঝতেও পারিনি।

কান্দাহার শহর দেখছি! আমি বললাম।

কিবা দেখার মতো আছে এই শহরে।

না তেমন কিছু নেই।

আরেকটু ঘুমিয়ে নিতে পারতি! ভাই বলল।

না, যথেষ্ট ঘুমিয়েছি।

তাহলে হাতমুখ ধুয়ে গোসল করে নে। আমি নিচে গিয়ে খাবারের ব্যবস্থা করি।

ভাইয়া এমন কিছু নিয়ে এসো না যা খেতে আমার কষ্ট হয়!

তুই যা খেতে চাস তা তো আনতে পারব না। দেখি চিকেন সুপ আর বাটার ব্রেড পাওয়া যায় কিনা।

আচ্ছা ঠিক আছে। আসার সময় একটু খোঁজ নিয়ে এসো আমাদের কাবুল যাওয়ার কি ব্যবস্থা হল।

আমার মনে হয় আজকের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি খোঁজ নিয়ে আসব। এই বলে মেজ ভাই নিচে চলে গেলেন।

আমি এসে বিছানায় একটু বসলাম। বাথরুমে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। এমন সময় অনুভব করলাম আমার তলপেটে চিন চিন করে ব্যথা করছে। আমি বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। না ব্যথাটা যেন ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এক সময় পেটের নিচে বালিশ চাপা দিয়ে শুয়ে রইলাম। ব্যথাটা বাড়ে আর কমে। কিন্তু একেবারে থেমে যায় না। আমি ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেলাম। ভাইকে ডেকে আনব সেইবা কি করবে– হঠাৎ মনে পড়ল কাল তো ওষুধ খাইনি। তাড়াতাড়ি ওষুধ বের করে খেয়ে নিলাম। নাহ্ কিছুতেই ব্যথা কমছে না। আমি দ্রুত গিয়ে টয়লেটে বসলাম। আর সাথে সাথে মনে হল আমার পেট থেকে আমার নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে সব যেন বের হয়ে গেল। আমি দশ মিনিট ঝিম মেরে টয়লেটের উপর বসে রইলাম। আমার একটুও শক্তি ছিল না উঠে দাঁড়াবার। মনে হল আমার সারা দেহ যেন অবশ হয়ে গেছে। মাথা ঝিমঝিম করছে। কোনোরকম একটু মাথাটা নিচু করে দেখলাম টয়লেট রক্তে লাল হয়ে গেছে, কিছু রক্ত আমার পা বেয়ে নিচে মেঝেতে গিয়ে পড়েছে।

কেন জানি আমার মনে হল আমি আর বাঁচব না! নানা কথা মনে পড়তে লাগল। যেসব কথা কখনো ভুলেও মনে আসত না, আজ সেসব কথাও মনে পড়তে লাগল। বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সবার কথা মনে আসতে লাগল। মনের অজান্তে চোখের পাতা ভিজে গেল! কতক্ষণ যে এভাবে বসে ছিলাম মনে নেই। হঠাৎ আমার মনে পড়ল, এ রকম অবস্থা তো আমার আগেও হয়েছে! তবে আমি এত ভেঙ্গে পড়ছি কেন! এই কথা মনে আসতেই আমি যেন আমার মনোবল ফিরে পেলাম। অনেক কষ্ট করে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম। অবশেষে বাথরুম সিঙ্কের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

মেজ ভাইকে কোনোভাবেই বুঝতে দেয়া যাবে না আমার এই অবস্থা। আমি বারংবার টয়লেট ফ্ল্যাশ করে রক্ত ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করলাম। শাওয়ার ছেড়ে তার নিচে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। মনে হচ্ছে কিছুটা যেন ভালো লাগছে। মেজ ভাই আসার আগেই আমার বাথরুম পরিষ্কার করে বের হতে হবে। আমি তাই করলাম। শেষে বিছানায় গিয়ে চাঁদর গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। মনে হল সমস্ত শরীরটা যেন চুপসে ভেঙ্গে পড়েছে। কখন যে আবার ঘুমিয়ে পড়েছি তা মনে করতে পারব না। অনেক

ডাকাডাকির পর চোখটা মেলে দেখলাম মেজ ভাই সামনে দাঁড়িয়ে আছে। টেবিলের উপর একগাদা খাবার। আমার কথা বলতে মোটেও ইচ্ছে করছিল না। একবার তাকিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। তখন মেজ ভাই আমার মুখ থেকে চাদরটা সরিয়ে বলল, এই মাত্র না ঘুম থেকে উঠলি, আচ্ছা বুঝেছি দুর্বল লাগছে। খাবার এনেছি খেয়ে না হয় শুয়ে পড়। এই বলে মেজ ভাই আমার মুখের দিকে তাকাল। কিরে তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন! উঠে বসত– এই বলে মেজ ভাই আমাকে ধরে বসাল।

তার চোখেমুখে কেমন যেন একটা আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠার ভাব!

আমি কত করে বলতে চেষ্টা করলাম, মেজ ভাই আমার কিছুই হয়নি। তুমি ভয় পেও না। কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারলাম না। কথা বলার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছি! ভীষণ দুর্বল লাগছিল।

মেজ ভাই আমাকে পুনরায় বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বাথরুমের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলেন। কারণ তিনি জানতেন আমার সমস্যার কথা। বিগত একটি বছর যাবৎ আমি এই রোগে ভুগছি। কোনো খাবারই আমার হজম হতো না! যা ই খেতাম বাথরুম গেলে রক্ত হয়ে সব নির্গত হয়ে যেত। রক্তশূন্যতায় আমার সারা দেহ ফ্যাকাসে হয়ে যেত। তাই প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার আমাকে ইনফেরন নামে রক্ত বৃদ্ধির ইঞ্জেকশন নিতে হত। মেজ ভাই বাথরুম থেকে বের হয়ে আমাকে বকতে লাগলেন। আমি যা সন্দেহ করেছি তাই হয়েছে, তুই আমাকে কিছু না বললেও আমি বুঝে নিয়েছি।

সব শুনেও আমি চুপ করেই রইলাম।

তুই দু'দিন ধরে কোনো ওষুধ খাচ্ছিস না! খাওয়া দাওয়াতেও অনেক অনিয়ম লক্ষ করছি। কেন এমন করছিস বল! মেজ ভাই উচ্চ কণ্ঠে একটু উৎকণ্ঠার স্বরেই কথাগুলো বললেন। আমি ইচ্ছা হচ্ছিল, ভাইকে বুঝিয়ে বলি, আমার তেমন কিছুই হয়নি! তুমি অযথাই ভয় পাচ্ছ! এ রকম তো আমার প্রায়ই হয়, এটা তো নতুন কিছু নয়! কিন্তু কিছুতেই আমি একটা কথাও বলতে পারলাম না! মনে হচ্ছিল, আমার কণ্ঠ যেন কেউ দু'হাতে চেপে ধরেছে! আমি আস্তে করে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম।

মেজ ভাই আমার কপালে হাত রেখে দেখল জ্বর আছে কিনা, তারপর রুম থেকে বের হয়ে গেল। আর আমি যে কখন বেহুঁশের মতো ঘুমিয়ে পড়েছি বুঝতেই পারিনি।

মেজ ভাইয়ের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এখন উঠে পড়।

আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখ মেলে তাকালাম। দেখলাম সত্যি সন্ধ্যা হয়ে গেছে! ক্ষুধায় পেট চো চো করছে! দেখলাম মেজ ভাই আমার জন্য মুরগির সুপ নিয়ে এসেছে।

সাথে নরম ডালেচালে খিচুড়ি, মশলা ছাড়া।

আমি কিছু না বলে গপাগপ খেয়ে নিলাম। ক্ষুধার রাজ্যে পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি! খাওয়া শেষে দেখি মেজ ভাই এক গাদা ওষুধের ফার্মেসি নিয়ে হাজির!

নে, ওষুধগুলো খেয়ে নে।

একটু পরে খাই।

গায়ে যেন একটু শক্তি ফিরে এসেছে।

আরে না, খাওয়ার পরেই খেতে বলেছে ডাক্তার।

অগত্যা খেতে হল সব ওষুধ।

কাবুল যাবার বাস ঠিক হয়ে গেছে। আগামী কাল সকালে আমরা রওয়ানা হব।

কত সময় লাগবে কাবুল যেতে মেজ ভাই? আমি শুধালাম।

আমি ঠিক জানি না। তবে যত সময়ই লাগুক না কেন আমাদের তো যেতেই হবে।

হুম! তা তো যেতে হবেই, আমি আস্তে আস্তে বললাম।

তোর শরীর এখন কেমন ?

আগের চেয়ে ভালো।

না, তুই মোটেই ভালো নোস! মেজ ভাই উদ্বিগ্ন হয়ে বলল।

বললাম তো ভালো আছি, আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম।

মেজ ভাইও বিরক্ত হয়ে বলল, তুই বললেই হল! আমার কি চোখ নেই! তোর চেহারা দেখলেই যে কেউ বুঝতে পারবে, এক ফোঁটা রক্ত তোর শরীরে নেই।

আমি আর উত্তর দিলাম না।

বাবা তোর রক্তের ইঞ্জেকশন 'ইনফেরন' আমার কাছে দিয়ে দিয়েছেন।

আমি শুধু ভাইয়ার দিকে একবার তাকালাম। তারপর আস্তে করে বললাম, কে দেবে ইঞ্জেকশন ?

এখানে কোনো ভালো ডাক্তার পেলাম না। কাবুল পৌঁছে ব্যবস্থা করব।

আমি নীরবে মাথা নাড়ালাম।

আর কোনো কথা হল না সেই রাতে মেজ ভাইয়ের সাথে। আমরা যে যার মতো ঘুমিয়ে পড়লাম। সকাল ৮টার দিকে একজন বাঙালি ভাই আমাদের রুমের দরজায় কড়া নেড়ে আমদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলেন।

আপনারা তৈরি হয়ে লবিতে নেমে আসুন। আমরা ৯টায় নাস্তা খেয়ে ১০টার মধ্যে কাবুল যাত্রা করব। বাঙালি ভাই আমাদের জানান দিয়ে গেল।

আমরা মুখ হাত ধুয়ে শাওয়ার করে লাগেজ গুছিয়ে ৯টা বাজার ১৫ মিনিট আগেই লবিতে এসে হাজির হলাম। এসে দেখি লবিতে সব বাঙালি যাত্রীরা কেউ কেউ নাস্তা শুরু করে দিয়েছে। আমরাও বসে পড়লাম একটা টেবিলে। মেজ ভাই একটা ডিম, বাটার টোস্ট, অরেঞ্জ জুস আর কফি নিলেল তার নিজের জন্য। আমার জন্য নিলেন বাটার টোস্ট, অরেঞ্জ জুস, একটা কলা, ব্যস!

আমার খেতে কেমন যেন ইতস্তত লাগছিল ভাই বললেন, খা, কিছু হবে না ইনশাল্লাহ। মুখে কোনো রুচি ছিল না। তবুও খেলাম। আবার কতক্ষণ না জানি না খেয়ে থাকতে হয়!

আকাশ মেঘাছন্ন। বেশ ঠান্ডা লাগছিল! গরম কাপড় গায়ে জড়িয়ে নিলাম। অবশ্য সবারই গায়ে গরম কাপড় ছিল। আমার হঠাৎ সেই দম্পতির কথা মনে পড়ে গেল। একটি কোলের শিশু আর একটি ৪/৫ বছরের ছেলে সাথে ছিল। কি না কষ্ট হয়েছে তাদের সেই যম ট্রাকের ভিতর। শিশুটি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিল ট্রাকের ঝাঁকুনি খেয়ে। মায়ের কত না কান্না আর আকুতি-মিনতি ট্রাক থামানোর জন্য। এই সব মনে হতেই আমার গা শিউয়ে উঠল। তারা কেমন আছে জানার জন্য আমার মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল।

আমি লবিতে গিয়ে এদিক সেদিক তাকাতে লাগলাম, যদি এক নজর তাকে দেখতে পেতাম! আমরা ৩৮ জন বাঙালি ছিলাম। নিশ্চয় তারাও এই ৩৮ জনের মধ্যে রয়েছে।

হোটেল লবির সামনে দেখলাম একটা বাস অপেক্ষমাণ। বাসটা দেখতে বেশ ভালোই ছিল। একেবারে নতুন না হলেও মন্দ না। ততক্ষণে সবাই বাসে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। আমরাও বাসে উঠলাম। আমার হঠাৎ চোখ পড়ল বাস ড্রাইভারের পিছনের আসনে একটি মহিলার উপর। বুকে তার দুধের শিশু, পাশে বসা সেই ৪/৫ বছরের খোকা। তাদের সাথে বসা একটি ভদ্রলোক। আমার বুঝে নিতে কোনো অসুবিধা হল না এই সেই পরিবার যারা অনেক কষ্ট সহ্য করে ট্রাকের মধ্যে ছিল। যদিও কষ্ট সবারই

ছিল কিন্তু আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না এই বাচ্চাদের মায়ের সেই হৃদয়বিদারক কান্না আর আহাজারি। আমি নিজেই যেচে গিয়ে ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই আপনার বাচ্চারা কেমন আছে? ভদ্রলোক তার ঠোঁটের কোনায় কিঞ্চিৎ হাসি দিয়ে বললেন, আল্লাহর মেহেরবানি ভালোই আছে। আমি আর বেশি কিছু জানতে চাইলাম না। কারণ ট্রাকের ভিতর তার যে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা হয়েছে আমাদের উপর, কেউ কেউ তো তার শিশুর গলা চেপে ধরতে বলেছিল যখন ট্রাক বর্ডারের কাছে চলে এসেছিল, যদিও সেই পরিস্থিতিতে কারো মাথা ঠিক ছিল না। তবুও ভদ্রলোক এবং তার স্ত্রী কে দেখে মনে হল, ট্রাকের সব যাত্রীদের উপর তেনারা নাখোশ। তবে তাদের সবাইকে সুস্থ এবং ভালো দেখে বিশেষ করে দুধের শিশুটিকে ভালো দেখে আমি যারপর নাই খুশি হয়েছিলাম। কারণ শিশুটির জন্য আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলাম। যাইহোক আমরা ৩৮ জন সকলেই সুস্থ অবস্থায় বাসে উঠে পড়লাম। একমাত্র আমিই ছিলাম অসুস্থ। তখন বাজে প্রায় সকাল ১০টা।

বাস কান্দাহার ছেড়ে ছুটে চলল কাবুলের পথে। আঁকাবাঁকা রাস্তা হলেও রাস্তা বেশ ভালোই ছিল। কান্দাহার শহর ছেড়ে যতই দূরে চলে যাচ্ছিলাম মনে হচ্ছিল, চারিপাশের পাহাড়গুলো যেন আমাদের ঘিরে ধরছে! এক অপরূপ দৃশ্য। ২ ঘণ্টা বাস চলার পর দেখতে পেলাম পাহাড়গুলোর চূড়া সব শুভ্রতায় ভরে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে শুরু হল তুষারপাত। হিমেল শীতল বায়ু যেন কন কনে ঠান্ডা হয়ে গায়ের হাড়ে প্রবেশ করছে! তড়িঘড়ি করে ব্যাগ থেকে গরম সোয়েটার মাফলার বের করে নাক কান মাথা আবৃত করে ফেললাম। তারপরেও যেন মনে হল ঠান্ডা কমছে না। তখনও বাসে হিটার বা এয়ারকন্ডিশানের ব্যবহার শুরু হয়নি। আরও ঘণ্টাখানেক বাস চলার পর দেখতে পেলাম চারিপাশের পাহাড়গুলো পুরোটাই শুভ্রতায় ছেয়ে গেছে। পথঘাট তীব্র তুষারপাতে সব একই রকম দেখা যাচ্ছে। ড্রাইভার এই পথে সব সময় যাতায়াত করে বিধায় তার জানা আছে কিভাবে পথ চিনে যেতে হয়। ড্রাইভার বাসের গতি কমিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে। তুষারপাত দেখতে আমার বেশ ভালোই লাগছিল! আমি বাসের জানালা দিয়ে যতদূর দেখা যায় আমার দৃষ্টি ততদূর নিয়ে যাচ্ছি।

শুভ্র তুষার ছাড়া আর আমার নজরে তেমন কিছুই পড়ছিল না। তবে মাঝে মাঝে তুষারে আবৃত ছোট ছোট ঘর দেখা যাচ্ছিল। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না, এই রকম দুর্যোগে এখানকার মানুষ থাকে কিভাবে!

ড্রাইভারকে দেখে অবশ্য মনে হল এরা এভাবে থেকেই অভ্যস্ত। এমন কনকনে শীতের মধ্যেও ড্রাইভার তার গায়ে শুধু মাত্র একটা চাঁদর দিয়ে তার মাথা নাক কান মুখ ঢেকে রেখেছে।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম দুপুর ৩টা বেজে গেছে। ৫ ঘণ্টা যাবৎ বাস চলছে। হোটেল লবি থেকে জানতে পেরেছিলাম, আবহাওয়া ভালো থাকলে ৫/৬ ঘণ্টায় আমরা কাবুল পৌঁছুতে পারব। অন্যথায় ৯/১০ ঘণ্টা লেগে যেতে পারে। আবহাওয়ার যে অবস্থা তাতে মনে হয় আমাদের কপালে আজ দুর্ভোগ রয়েছে! বেলা বাজে মাত্র ৩টা, তাতেই মনে হচ্ছে অন্ধকার হয়ে আসছে!

আমরা ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম, কাবুল পৌঁছুতে আর কতক্ষণ লাগতে পারে! মনে হল ড্রাইভার বিরক্ত হয়ে বলল, পাতাহ নেহি!

আমরা আর কেউ কিছু বললাম না। বাস ধীর গতিতে এগিয়ে চলছে। এভাবে আরও ৫ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেল। রাত ৮টা বেজে গেছে। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার! তার মধ্যে বাস চলছে ঠুক্কুর ঠাক্কুর করে। সবার মনমেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আমাদের মধ্যে একজন ড্রাইভারকে অনুরোধের স্বরে বলল, ড্রাইভার সাব বাস থোরাসা তেজ চালাও না। বলা মাত্রই ড্রাইভার ক্ষেপে গিয়ে বলল, ফির আও তুম চালাও।

আবার সবাই চুপ। কারও মুখে কোনো কথা নেই। কিছু দূর যেতে না যেতেই দেখি বাসের গতি আরও কমে গেছে। অনেকেই উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, কেয়া হুয়া ড্রাইভার সাব!

বাস রুকনা পারেগা। ড্রাইভার বলল।

কিউ কিউ কিউ? সমস্বরে অনেকেই একসাথে বলে উঠল।

বাস খারাপ হো গিয়া, ড্রাইভার বলল।

আমরা সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম–রাত বাজে প্রায় ৯টা, এতক্ষণে আমাদের কাবুল পৌঁছে যাবার কথা। আর ড্রাইভার বলছে, বাস খারাপ হয়ে গেছে।

আরও একটি বিষয় সবার চোখে পড়ল, বাসটা খারাপ হয়েছে রাস্তার পাশে একটা পাথরের ঘরের সামনে। ঘরের ভিতরে টিপ টিপ করে মৃদু আলো জ্বলছে।

ড্রাইভার ঠিক ওখানেই বাস থামিয়ে বলল, তোমরা গাড়িতেই বসো,আমি দেখছি ইঞ্জিনটা। এই বলে ড্রাইভার বাস থেকে নেমে পড়ল।

পাথরের ঘরের ভিতর থেকে চাঁদরে মোড়া দুই জন বিশালদেহী কাবুলি বের হয়ে ড্রাইভারের সাথে যেন ফিস ফিস করে কি বলল।

তাই না দেখে আমাদের সবার মনে সন্দেহের দানা বাঁধল। নিশ্চয়ই কোনো কুমতলব করছে ওরা। আমাদের সন্দেহটা সঠিক হয়ে ধরা দিল যখন একটু পর ড্রাইভার এসে বলল, বাস আজকে আর ঠিক হবে না। আজ রাতে আমাদের এখানেই থাকতে হবে। কাল সকালে মেকানিক নিয়ে এসে বাস ঠিক করে রাওয়ানা দেব। ড্রাইভার আরও বলল, এখান থেকে কাবুল বেশি দূর নয়, আমরা দুই ঘণ্টায় কাবুল পৌঁছে যাব।

আমরা প্রায় সবাই চেঁচিয়ে উঠলাম, না না, আমরা এখানে থাকব না। যে ভাবেই হোক আজ আমাদের কাবুল পৌঁছাতে হবে। বাসে মহিলা আর ছোট শিশু রয়েছে, ওরা অসুস্থ হয়ে পড়বে। ড্রাইভার বলল, তোমরা এই ঘরে রাতটা কাটাতে পার, ভিতরে আগুন জ্বলছে, ঘরটা গরম আছে। চা রুটি ও খেতে পার।

নেহি নেহি নেহি! আবার আমরা সবাই চেঁচিয়ে উঠলাম।

আমরা কেউ বাস থেকে নামলাম না।

ড্রাইভার তখন ক্ষেপে গেল। সে ঘটঘট করে সেই ঘরটার ভিতরে চলে গেল।

এমন সময় দেখলাম, বাসের ভিতর থেকে ৩/৪ জন বাঙালি বাস থেকে নেমে ওদের সাথে কথা বলছে, তারা ড্রাইভারকে বোঝাতে চেষ্টা করল, আমরা সাধারণ যাত্রী নই। আমরা সরকারি লোক। আমরা যদি এখন পুলিশে ফোন করি তাহলে তোমাদের বিপদ হতে পারে।

ড্রাইভার বলল, বাস ঠিক না হওয়া পর্যন্ত আমরা যেতে পারছি না। আমাদের মাঝ থেকে তখন একজন বলে উঠল, আমাকে বাসের চাবি দাও। দেখি কি খারাপ হয়েছে।

তুমি বাসের কি বুঝবা, তুমি কি মেকানিক? ড্রাইভার বলল।

আরে চাবিটা দাও না, আমি মেকানিকের বাপ। বাঙালিটা বলল।

প্রথমত ড্রাইভার চাবিটা দিতে চায়নি। আমরা সবাই তখন চাবির জন্য রীতিমতো গণ্ডগোল বাঁধিয়ে দিলাম। আমরা সংখ্যায় বেশি ছিলাম, তাই ড্রাইভার একটু হকচকিয়ে গেল। কি ভেবে যেন ড্রাইভার চাবিটা দিয়ে দিল। চাবি নিয়ে বাঙালি ভাই বাসের ইঞ্জিনের হুডটা খুলল। কিছুক্ষণ ধরে কি সব দেখে বলল, আমার তো মনে হয় গাড়ির কিছুই হয়নি। এই বলে গাড়ির হুডটা বন্ধ করে ড্রাইভারের সিটে গিয়ে বসল এবং চাবি ঘুরাতেই

বাস স্টার্ট নিয়ে নিল। হুড়মুড় করে আমরা সবাই বাসে গিয়ে উঠলাম। আমরা ড্রাইভারকে বললাম, তুমি চালাবে না আমরাই বাস চালিয়ে চলে যাব?

ড্রাইভার তখন রাগে ঘটঘট করে এসে বাসে উঠল। আর একটি কথাও সে বলল না। বাস নিয়ে সে স্বাভাবিক গতিতেই ছুটে চলল কাবুলের পথে। আমরা ঠিক রাত ১১টায় কাবুলে ভারতীয় দূতাবাসের সম্মুখে এসে দাঁড়ালাম।

রাস্তার পাশে সোডিয়াম লাইট জ্বলছে। রাস্তার দুপাশে বরফের স্তূপ। তখনও গুঁড়ি গুঁড়ি শুভ্র তুলার মতো আকাশ থেকে তুষার ঝরছে। সোডিয়াম লাইটের আলোতে তুষারপাত অপূর্ব লাগছিল। প্রচণ্ড ঠান্ডায় হাত পা জমে যাচ্ছিল। সোডিয়াম লাইটের আলোতে যতটুকু দেখা যাচ্ছে তা শুধু রাস্তার কিছু অংশ। তার বাইরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

দুজন বাঙালি ভাই বাস থেকে নেমে ভারতীয় দূতাবাসের প্রধান ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই পাগড়ি পরা একজন শিখ এসে তাকে স্বাগতম জানালেন। তারপর একে একে আমরা সবাই আমাদের লাগেজ নিয়ে ভারতীয় দূতাবাসের ভিতর ঢুকে গেলাম। আমাদের সবার শরীর বরফের মতো ঠান্ডা ছিল, ভিতরে ঢুকতেই একটা গরম আমেজ পেলাম। কি যে শান্তি লাগল বলে বোঝানো যাবে না। সবাই আমরা ভীষণ ক্লান্ত ছিলাম। দেখলাম ভারতীয় দূতাবাসের এক ভদ্রলোক গিয়ে বাসের ভাড়া চুকিয়ে দিচ্ছে। আমাদের কাছ থেকে একটি পয়সাও নিল না।

দূতাবাস থেকে আমাদের প্রত্যেক বাঙালিকে একটি করে ফর্ম দেয়া হল পূরণ করার জন্য। উপরে লেখা ছিল ভিসা ফর্ম। আমাদের ভারত যাওয়ার ভিসার জন্যই এই ফর্মটি পূরণ করতে হবে। আমরা ফর্ম পূরণ করতে লেগে গেলাম। লিখতে গিয়ে দেখি আঙ্গুল চলে না। ঠান্ডায় যেন জমে গিয়েছে। ভিতরে ফায়ার প্লেস ছিল। সেখানে অনেকেই হাত গরম করে নিচ্ছিল। আমিও গিয়ে কিছুক্ষণ হাতটা গরম করে নিলাম। মেজ ভাইকেও দেখলাম হাত গরম করছে। তারপর একে একে সবাই ফর্ম পূরণ করলাম। সাথে আরও একটি ছোট ফর্ম ছিল। সেখানেও স্বাক্ষর করতে হল। আমাদের প্রত্যেককে ৭০০ আফগান করে আফগানি কারেন্সি দেয়া হয়েছে। এটা নাকি আমাদের কর্জ হিসেবে দেয়া হয়েছে, যদিও আমরা কেউ তা চাইনি। পরে বাংলাদেশ সরকার সেই কর্জ আমাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তবে ভারতীয় সরকার আমাদের কাছ থেকে বাস ভাড়া, হোটেলে থাকা

খাওয়া এমনকি কাবুল থেকে দিল্লি যাবার প্লেন ভাড়াও নেয়নি। আমরা এইজন্য ভারত সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ ছিলাম। যাইহোক, ৭০০ আফগান পকেটে নিয়ে বেশ ভালোই লাগছিল পকেট খরচের কথা ভেবে। আমার কাছে ৫০০ পাকিস্তানি রুপি ছিল, তখন ১০০ পাকিস্তানি রুপি সমান ৭০০ আফগান ছিল। মেজ ভাইয়ের কাছেও ৫০০ রুপি ছিল। বাবা আমাদের আলাদা করে টাকাগুলো আমাদের পকেটে গুঁজে দিয়েছিলেন।

পরে দূতাবাসের গাড়িতেই আমাদের সবাইকে বিভিন্ন হোটেলে পৌঁছে দেয়া হল। আমাকে আর মেজ ভাইকে দেয়া হল হোটেল আবাসিনে। দোতালা হোটেল, দেখতে বেশ ভালোই ছিল। আমাদের নিচের তলায় একটি রুমে দেয়া হল। রাতের বেলা চারিদিকে শুভ্র বরফ ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ল না। কোনো রকম লাগেজ নিয়ে আমরা রুমে গিয়ে ঢুকলাম।

রুমটা বেশ গরম ছিল। ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছিল। পাশেই রাখা ছিল কিছু কাঠ আর লাকড়ি। আগুন কমে গেলে সেগুলো ব্যবহার করতে বলা হয়েছিল। রাত তখন প্রায় ২টা বাজে। আমি কোনো রকম কাপড় চেঞ্জ করে সোজা পশমি কম্বলের ভিতর গিয়ে ঢুকলাম। মেজ ভাইকে একবার বলতে শুনলাম, তোর শরীর কেমন? এখন ক্ষুধা আছে, কিছু খেতে চাস? আমি কোনো উত্তর করলাম না। কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি তা নিজেও জানি না। বরাবরই আমার যখন ঘুম পায় আমাকে কেউ আটকিয়ে রাখতে পারে না। মুহূর্তের মধ্যেই আমি ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যাই। এখনও আমার সেই অভ্যাস রয়ে গেছে। সকাল ১০টায় রুম সার্ভিস দরজার কড়া নেড়ে জানান দিল, রুম সার্ভিসের প্রয়োজন আছে কিনা। শুনেও আমি চুপ করে রইলাম। কোনো সাড়া না পেয়ে রুম সার্ভিস চলে গেল।

অবশ্য আমার আর ঘুম আসল না। উঠে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নিলাম। মেজ ভাই আমাকে না জাগিয়ে রুমের বাইরে চলে গিয়েছে। আমার জন্য ভালোই হল। একটু ভালো করে ঘুমিয়ে নিলাম। রুম সার্ভিস না জাগালে আরও ঘণ্টা খানেক ঘুমাতে পারতাম। আসলে অসুস্থ হবার পর আমি যেন কেমন ঝিমিয়ে পড়েছিলাম। বেশি পরিশ্রম করতে পারতাম না। শরীরে কোনো বল শক্তি পেতাম না। কোনো খাবারই পেটে থাকতে চাইত না। তাই খাবার খেতেও ভয় পেতাম। আর প্রোটিন শরীরে না থাকলে যা হয়। আয়নাতে নিজেকে দেখলে আমি নিজেই অস্বস্তি বোধ করতাম। ভাবতাম আমার বুঝি সময় ফুরিয়ে এসেছে। তাই মনে হত সব সময় ঘুমিয়ে থাকি। যাইহোক, রুম থেকে বের হয়ে দেখলাম মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, শিমুল তুলার

মতো ঝুরঝুর করে তুষারপাত হয়েই চলেছে। হোটেলের চারিপাশ শুভ্রতায় ছেয়ে গেছে। পাতা শূন্য গাছগুলোর ডালপালা দেখে মনে হল, এক একটি গাছ যেন সাদা কঙ্কাল। ডানে বাঁয়ে যেদিকে তাকাই সাদা বরফে ঢাকা দানবের মতো বিশাল বিশাল পর্বতমালা। আর তারই ভাঁজে ভাঁজে ঘড়বাড়িগুলো সাদা বরফের চাদর মুড়ি দিয়ে যেন আত্মগোপন করে আছে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের দেখলাম কারো কানটুপি পরা আবার কারো কান খোলা। গায়ে হাল্কা গরম কাপড় পরে বরফের মধ্যে খেলা করছে। আমি অভিভূত হয়ে দেখে রইলাম। আমাদের ঠান্ডায় হাড্ডিমজ্জা সব জমে যাচ্ছে আর এরা কত সুন্দরভাবে নিশ্চিন্তে খেলে বেড়াচ্ছে। পাঠানরা মাত্র একটা চাদর দিয়ে কান, নাক, মুখ ঢেকে তাদের কাজ করে যাচ্ছে। এই তুষার ঠান্ডা বরফ কিছুই তাদের কাবু করতে পারছে না, বরং মনে হচ্ছে ঠান্ডাই ওদের কাছে কাবু হয়ে যাচ্ছে। এদিকে হিমেল হাওয়া যেন আমার এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। আমি সোয়েটার কোট মাফলার হাত মোজা পা মোজা দিয়ে সব ঢেকে বের হয়ে ডাইনিং রুম খুঁজছিলাম। বেশিক্ষণ খুঁজতে হল না। নিচের তলাতেই ডাইনিং রুম ছিল। সেখানে গিয়ে দেখলাম সারি সারি খাবার সাজানো রয়েছে।

গতকাল রাত থেকে তেমন কিছুই পেটে পড়েনি। ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করছিল। কাবাব ছিল আমার ভীষণ একটা প্রিয় খাবার। সেই কাবাবই ছিল সেখানে ৪/৫ রকমের। ডাইনিং রুমে বিদেশি ভ্রমণকারীরাই ছিল সংখ্যায় বেশি, কিছু বাঙালি এবং শিখ সম্প্রদায়ও ছিল। গ্রিল থেকে ঝলসানো কাবাবগুলো সদ্য এনে রাখা হয়েছে। তখনও ধোঁয়া উড়ছে। আর আমি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। কাবাবের গন্ধে চারিদিক মৌ মৌ করছে। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল সবগুলো কাবাব এক নিঃশাসে শেষ করে দেই। আমি কিছুক্ষণের জন্য ভুলেই গিয়েছিলাম, এই সব খাবার বিশেষ করে ঝাল গরুর মাংস, কাবাব আমার জন্য বিষস্বরূপ। করাচি এম্প্রেস মার্কেটের সামনে ব্যস্ত রাস্তার পাশে কিছু বিহারি এবং পাঠানরা বিভিন্ন রকম কাবাব কাঠের চুলায় গ্রিল করে বিক্রি করত প্রতিদিন। আমি দুপুরে স্কুল থেকে ফেরার পথে ওদের পাশ কাটিয়ে গিয়ে বাসে উঠতাম। অনেক দূর থেকেই সেই কাবাবের গন্ধ আমার নাকে আসত আর আমার মন পাগল হয়ে উঠত সেই কাবাব খাবার জন্য। আমি পয়সা জমাতে শুরু করলাম। একদিন সেই শুভ সময় এসে হাজির হল। আমি দু' দু'বার নিয়ে সেই কাবাব পেট ভরে খেলাম। বাবা মা সব সময় বলতেন, বাবা রাস্তার পাশে খোলা খাবার

কখনোই খাবে না। কিন্তু প্রতিদিন স্কুল থেকে ফেরার পথে ক্ষুধারত পেটে যখন এই কাবাবের গন্ধ নাকে আসত তখন আর সেই উপদেশ মনে থাকত না। কিন্তু সেই খাওয়াই হল আমার জন্য কাল এখন পর্যন্ত এই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আমি ভুগছি। কত ডাক্তার দেখানো হল, কত ওষুধ খাওয়া হল। কত প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হল। কোনো কিছুতেই কিছু হল না। মাঝে শুধু বাবার কষ্টার্জিত অর্থ জলে গেল।

যাইহোক, আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম সেই কাবাবের সামনে। আমার সম্মুখ থেকে অনেকেই প্লেটে করে কাবাব নিয়ে তৃপ্তি সহকারে খাচ্ছে। আমি দাঁড়িয়ে থেকে শুধুই দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, আমি কি করব। এদিকে কাবাবের গন্ধে আমার পেটের মধ্যে অলরেডি ছুঁচো ডন দিচ্ছে। বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা। এই মুহূর্তে গরম কফি বা চা পান করলেও শরীরটা গরম হত। আশে পাশে তাকিয়ে দেখলাম মেজ ভাইকে দেখা যায় কিনা, না কোথাও তাকে দেখা গেল না। হয়তো কারো সাথে কোথাও খোশগল্পে মশগুল। মেজ ভাই আবার আড্ডা দিতে পছন্দ করে। ডাইনিং রুমে অবশ্য আমার খাবার উপযোগী অনেক খাবারই ছিল। তবে আমার মনটা সেদিকে মনোনিবেশ করেনি। অনেক দিনের অভুক্ত আমি। আমাকে শাসন করার বা বাধা দেয়ার মতো বাবা মা কিম্বা মেজ ভাইও কাছে নেই। মাথায় আবারো দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল। ভাবলাম তেল মশলা ঝাল ছাড়া তো অনেক খাবারই খেলাম এই একটি বছর। কোনোই তো লাভ হয়নি। সবই ব্লাড হয়ে বেরিয়ে যায়। তবে আর এটা কি দোষ করল।

আমি চারপাশে আরও একবার ভালো করে দেখে নিলাম। না মেজ ভাইকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আমি আর কাল বিলম্ব না করে প্লেট ভরে সব ধরনের কাবাব নিলাম। সাথে সালাদ আর অরেঞ্জ জুস। পাশে ব্রেড ছিল কিন্তু আমি তা স্পর্শ করিনি। আজ আমি শুধুই কাবাব খাব। মনের তৃপ্তি মিটিয়ে। তারপর যদি আমাকে এইজন্য মরতেও হয় আমার কোনো আফসোস থাকবে না যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। প্লেট ভর্তি করে কাবাব নিয়ে খেতে বসলাম। ক্ষুধাও ছিল প্রচণ্ড। মনের তৃপ্তি মিটিয়ে ইচ্ছামতো পেট ভরে খেলাম। বিগত এক বছরে আমি যা খাইনি। খাওয়া শেষ করে এক মগ ভর্তি গরম কফি নিলাম। প্রাণ ভরে খেলাম। যা আমার জন্য হারাম ছিল। ডাক্তারের নিষিদ্ধ করা সব খেলাম। খেয়েদেয়ে হোটেলের বেলকনিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাইরে বরফে আচ্ছাদিত শহরের এক অদ্ভুত রূপ দেখছিলাম। আর মাঝে মাঝে মনের গভীরে এক অজানা আতঙ্ক

উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। এই বুঝি আমার মৃত্যু ঘণ্টা বেজে উঠল। আমি চেষ্টা করছিলাম ওই সব চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে দিতে। কিন্তু এতসব খাবারের পর আমার বেশ ভালোই লাগছিল। মনে হল আগের সেই দুর্বলতা অনেকটা কেটে গেছে।

এমন সময় দেখলাম কিছু আফগান কিশোর শ্লেষ গাড়ির মতো পাহাড় থেকে স্লিপ কেটে নিচে নামছে। আবার তারা ধীরে ধীরে বরফ কেটে কেটে পাহাড়ের উপর উঠে সেই চাকা ছাড়া শ্লেষ গাড়িতে উঠে দ্রুত গতিতে নিচে নেমে আসছে। দেখতে বেশ ভালোই লাগছিল। শহরে গাড়ি চলছিল, তবে প্রত্যেকটি গাড়ির চাকায় চেইন লাগানো রয়েছে। কারণ চেইন ছাড়া গাড়ি বরফে ঢাকা রাস্তার উপর চলতে পারে না। প্রায়শই নাকি এখানে তুষারঝড় হয়। বাইরে বাতাস না থাকলে তেমন বেশি শীত লাগে না। কিন্তু বাতাস শুরু হলেই বাইরে দাঁড়ানো কঠিন হয়ে যায়। বেশির ভাগ সময়ই আকাশ মেঘাছন্ন থাকে। মাঝে মাঝে সূর্যি মামার দেখা মেলে কিছুক্ষণের জন্য। কিন্তু সূর্যের তাপেও ২০ ডিগ্রি থাকে তাপমাত্রা। সুতরাং সূর্য উঠলে একটু আলো দেখা যায় বেশি কিন্তু তাপের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। প্রথমত সূর্য দেখে আমরা কাপড় ধুয়ে রোদে দিয়ে দেখেছি। কাপড় তো শুকায়ই না, বরং কাপড়ের পানি বরফ হয়ে শক্ত হয়ে থাকে।

যখন শহরে বায়ুপ্রবাহ কম থাকে তখন অনেকেই রাস্তায় নেমে পড়ে বাজার সদাই করার জন্য। আমিও শহরটা ঘুরে বেড়িয়েছি। গরম কাপড় কেনার জন্য কাপড়ের দোকানে গিয়ে দেখি শত শত দোকান যেন লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। শতকরা ৯০ ভাগ কাপড়ের দোকানই শিখদের। আরও অনেক দোকানপাট রয়েছে। পাহাড় দিয়ে ঘেরা কাবুল শহর। সব পাহাড়ই বরফ দিয়ে ঢাকা। মনে হল আমরা কোনো একটি তুষারপুরীতে আছি। সারাক্ষণই গুঁড়ি গুঁড়ি তুষারপাত হয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড তুষারঝড় শুরু হয়। তখন স্থানীয় পথচারী পাঠানরাও কোথাও গিয়ে আত্মরক্ষা করে।

প্রচণ্ড ঠান্ডা হলেও আমি ভীষণ উপভোগ করছিলাম এই দৃশ্য, কারণ আমি কখনো তুষারপাত কিম্বা তুষার ঝড় দেখিনি। শুধু বইতে পড়েছি এবং টেলিভিশনে দেখেছি। তাই আজ স্বচক্ষে দেখে নিজেকে ভাগ্যবান মনে হল। মাঝে মাঝে নিজেকে এস্কিমোদের মতো মনে হতে লাগল। হাত পা গরম মোজা দিয়ে ঢাকা, মাথায় কান টুপি, তার উপরে মাফলার দিয়ে প্যাঁচানো। গায়ে দুটো ফুল গেঞ্জি, দুটো ফুল হাতা সার্ট, তার উপরে মোটা

সোয়েটার, তার উপরে উলেন কলারওয়ালা লং জ্যাকেট এবং বুট জুতা। এই সব পরে কখনো আমি অভ্যস্ত নই। তবুও বেশ ভালোই লাগছিল।

সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এল। সারাদিন হোটেলের ক্যান্টিনে যখন যা ইচ্ছে হয়েছে তাই খেয়েছি। ওষুধ খাওয়ার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। এখন সন্ধ্যার পর সব মনে হতে লাগল। কিছু খাওয়ার পর সাধারণত আমার পেটে হাঁকডাক শুরু হত, তারপরেই বাথরুমে ছুটতে হত। কিন্তু এখন আমি খেয়াল করে দেখলাম, আমার তেমন কোনো সিমটম এখনও দেখা দেয়নি। আমি কিছুটা শঙ্কিত ছিলাম আবার কিছুটা আশ্বস্তও ছিলাম এই ভেবে, হয়তো বা আমার দীর্ঘদিনের অসুখটা ভালোর পথে। আবার মনে হতে লাগল, আগেও তো আমার একাধিক বার এমনই মনে হয়েছিল কিন্তু সব ভুল প্রমাণিত হয়ে আমি আবার বিছানায় মুখ থুবড়ে পড়েছি। যাইহোক, হোটেল রুমে ঢুকে বিছানায় বসে বসে ভাবছি সারাদিন কি খেয়েছি। এমন সময় মেজ ভাই রুমে ঢুকে আমাকে দেখে একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায় ছিলি সারাদিন!

এই তো, হোটেলের আশেপাশেই ছিলাম।

খাওয়া দাওয়া করেছিস ঠিকমতো?

হুম খেয়েছি –

ওষুধ খেয়েছিস তো?

খেয়েছি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মিথ্যা বলে দিলাম। নয়তো ২০ মিনিট ধরে বকাঝকা শুনতে হত।

আপনি কোথায় ছিলেন ? সারাদিন যে দেখিনি।

ইন্ডিয়ান অ্যামবাসিতে গিয়েছিলাম।

আমি আর জিজ্ঞেস করলাম না কেন গিয়েছিল। কারণ আমি নিজের চিন্তায় অস্থির ছিলাম।

সেদিন রাতে আর বেশি কথা না বলে আমি কাপড় চেইঞ্জ করে সোজা বিছানায় চুপটি মেরে শুয়ে রইলাম আর অপেক্ষা করতে থাকলাম কখন জনাব বাথরুম আমাকে সমন পাঠাবে আর আজ সারাদিনের ভুলের খেসারত সেখানেই দিতে হবে।

এইসব ভাবতে ভাবতে আমি কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম বুঝতেই পারলাম না। সকাল বেলা আবার সেই রুম সার্ভিসের ডাকাডাকিতে ঘুম

ভাঙল। মেজ ভাই তখন বাথরুমে। আমি বিছানা থেকে নেমে চেয়ারে গিয়ে বসলাম। ইতোমধ্যে মেজ ভাই বাথরুম থেকে বের হয়ে আসলেন।

কিরে তোর শরীর কেমন?

ভালো।

সত্যি কি ভালো না ওষুধ খাওয়ার ভয়ে বলছিস?

না সত্যি আগের চেয়ে ভালো মনে হচ্ছে।

হুম তোকে দেখে অবশ্য কিছুটা ভালোই মনে হচ্ছে। তাই বলে উল্টাপাল্টা কিছু খাসনে যেন।

না তেমন কিছু খাচ্ছি না। ভেজিটেবেল ফ্রুটস আর জুস।

এখানে কিছু হলে দেখার কেউ নেইরে ভাই।

আমি মনে মনে বললাম, হুম! আপনি মজার মজার কাবাব কারি খাবেন আর আমি সবজি খাব।

তুই হাতমুখ ধুয়ে কেন্টিনে গিয়ে কিছু খেয়ে নিস। আমাকে আবার ইন্ডিয়ান অ্যামবাসিতে যেতে হবে।

গতকালও তো গিয়েছিলেন। কোনো সমস্যা হয়নি তো ?

আরে না সমস্যা নয়, আমাদের পাসপোর্ট আর ভিসার ব্যাপারে।

ও আচ্ছা।

তোর শরীর ভালো থাকলে তুই বাইরে গিয়ে একটু ঘোরাঘুরি করে আসতে পারিস। তবে খেয়াল রাখবি, বাইরে বাতাস থাকলে ভুলেও বের হোস না। ঠান্ডায় জমে যাবি।

হুম! আমিও তা আঁচ করতে পেরেছি।

আমি চলে আসব ২/৩ ঘণ্টার মধ্যেই। বিকেলে ওয়েদার ভালো থাকলে দু'ভাই মিলে শহরটা ঘুরে বেড়াব। এই বলে মেজ ভাই বেরিয়ে গেলেন। আর আমি তখনো চেয়ারে বসে আছি। শরীরটা আসলেই আগের চেয়ে ভালো লাগছিল। তবুও বাথরুমে যাবার কথা ভাবলে মনটা কম্পিত হয়ে ওঠে। গতকাল অনেক কিছুই খেয়েছি। পেট ভরে খেয়েছি। যা মন চেয়েছে তাই খেয়েছি। পেটটা তাই এখন ভার হয়ে রয়েছে। বাথরুমে না গেলেই নয়। আল্লাহর নিকট অনেক প্রার্থনা করে বাথরুমে গেলাম। কিন্তু এবার আর এক ফোঁটাও রক্ত চোখে পড়ল না। আমি খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলাম।

আমি মাটিতে সেজদা করে আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। আমার অজান্তেই আমার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াতে লাগল। তার মানে

আমি ভালো হয়ে গেছি! আমার কাছে কেন জানি স্বপ্নের মতো মনে হতে লাগল। তাই আমি আগের চেয়ে অনেক ভালো ফিল করছিলাম। কোনো কিছু খাবার পর আমার পেটে যে অস্বস্তিকর অবস্থা শুরু হত এবার তা হয়নি মনে হচ্ছিল, আমার শরীরে আগের চেয়ে এনার্জি অনেক বেড়ে গিয়েছে। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না, এতদিনের দুরারোগ্য ব্যাধি কাবুলে আসার পরপরই ভালো হয়ে গেল– এটা কিভাবে সম্ভব তবে হ্যাঁ, গল্পের বইতে পড়েছি, ডাক্তার যখন কোনো রোগীকে জবাব দিয়ে দেয় তখন তাকে পরামর্শ দেন হাওয়া বদল করতে। মানে হল কোনো স্বাস্থ্যকর পরিবেশে রোগীকে নিয়ে যেতে। সেখানে গেলে হয়তো সে ভালো হয়েও যেতে পারে। জানি না সেই রকম কিছু একটা হল কিনা। যাইহোক, আমি ঝটপট কাপড় পরে ক্যান্টিনে গিয়ে মনের সাধ মিটিয়ে ব্রেকফাস্ট করলাম। তারপর হোটেল ফ্রন্ট অফিসে গিয়ে বললাম, মে আই কল টু কারাচি, পাকিস্তান ?

এক রুপি নিয়ে তারা আমাকে করাচি লাইন লাগিয়ে দিল। আমি বাবার সাথে কথা বলে জানালাম আমার অবস্থার কথা। বাবা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইলেন না আমার কথা। বাবা বললেন, তোমার মেজ ভাইকে বল আমাকে যেন কল দেয়। তার মানে বাবা আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। আমি বললাম, আচ্ছা আমি মেজ ভাইকে বলব কল করতে। আমি আর কাল বিলম্ব না করে ছুটে বেরিয়ে পড়লাম বরফে ঢাকা রাস্তার উপর। রাস্তার পাশেই তুষারের স্তূপ। আমি পা দিতেই পা ১ ফিট নিচে ঢুকে গেল। অনেকক্ষণ ছুটাছুটি করলাম তুষারের উপর মুক্ত বিহঙ্গের মতো। বাইরে তখন মোটেও বাতাস ছিল না। তাই তেমন ঠান্ডাও ছিল না। অনেক আফগানি ছেলে মেয়েরা বরফের উপর স্কি নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। এক সময় হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করল। আমি তাড়াহুড়ো করে হোটেলের দিকে ছুটে চললাম। ততক্ষণে ঝুরঝুর করে আকাশ থেকে তুলার মতো তুষার পড়তে শুরু করেছে। আমার গায়ে তেমন কোনো গরম কাপড় ছিল না। কোনো রকমে হোটেলে পৌঁছে দেখি আমার পায়ে স্যান্ডেল নেই। ঠান্ডায় আমার পায়ের পাতা এমনি জমে গিয়েছিল যে আমি বুঝতেই পারিনি কখন পা থেকে আমার স্যান্ডেল খুলে গিয়েছে।

আমি ক্যান্টিনে গিয়ে বড় এক মগে গরম চা নিয়ে পুরোটাই পান করলাম। হোটেল ক্যান্টিন ২৪ ঘণ্টাই খোলা থাকে চা কফির জন্য। আমি রুমে চলে গেলাম। তারপর হট শাওয়ার নিলাম। মেজ ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। দুপুর দুটা বেজে গেল। মেজ ভাই এলেন না।

আমি তাই আর অপেক্ষা না করে ডাইনিং রুমে চলে গেলাম দুপুরের খাবার খেতে। অনেকেই দুপুর একটার মধ্যে লাঞ্চ করে চলে গিয়েছে। ডাইনিং রুমে তাই তেমন ভিড় ছিল না।

আমি সবে রাজকীয় খাবার নিয়ে আমার টেবিল সাজিয়ে বসেছি। মেজ ভাই হঠাৎ করে কোত্থেকে যেন আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

একি? তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ভাই মেজ ভাই ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন।

আমি ভূত দেখার মতোই কিছুটা চমকে উঠে বললাম, মেজ ভাই, আপনি।

হুম, আমিই তো!

লাঞ্চ করেছেন ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

না, লাঞ্চ করতেই তো এলাম।

তাহলে বসেন একসাথে খাই।

বসলাম না হয়, কিন্তু তুই এই সব খাবার কার জন্য এনেছিস!

কেন, আমার জন্য!

তুই কি পাগল হয়ে গেলি?

কেন কি হয়েছে? আমি একটু মুচকি হেসে বললাম।

এই খাবার খেলে তুই তো আজ রাতেই মারা যাবি, তোকে বাংলাদেশ পর্যন্ত নিতে পারব না।

কি যে বলেন ভাইয়া, আমি ভালো হয়ে গেছি।

ভালো হয়ে গেছিস মানে!

আমি এবার হেসে বললাম, মানে ভালো হয়ে গেছি। কাল দুপুর ও রাতেও তো আমি এই খাবারই খেয়েছি, আল্লাহর রহমতে আমার কিছুই হয়নি।

মেজ ভাই আমার কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন. সত্যি করে বল তো তোর কি হয়েছে?

আমি বললাম, কাবুল আসার পর থেকে ওষুধ পথ্য খাওয়া বাদ দিয়ে দিয়েছি। ওইসব ছাইপাশ খাওয়াও বাদ দিয়ে দিয়েছি। অন্য সবার মতো রেগুলার খাবার খাচ্ছি। বলতে পার অন্য সবার চেয়ে একটু বেশিই খাচ্ছি। দীর্ঘ একটি বছরের অভুক্ত আমি, তাই।

এটা কিভাবে সম্ভব?

জানি না কিভাবে সম্ভব হয়েছে, তবে হয়েছে। আমার দিকে তাকিয়ে দেখ আগের চেয়ে অনেক ইমপ্রুভ মনে হচ্ছে না বল?

হুম কিছুটা তো বেটার লাগছে। তোর বাথরুম ঠিক হচ্ছে ?

হুম ১০০ পারসেন্ট কোনো সমস্যা নাই। নো ব্লাড এট অল। যা খাচ্ছি সব হজম হয়ে যাচ্ছে।

এবার মেজ ভাই কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে বললেন, এটা তো মিরাকল!

আমি হেসে বললাম, ইয়েস, ইট ইজ।

আমি তখন মেজ ভাইকে বললাম, আপনি বাবাকে এখুনি একটা ফোন করেন। বাবা আপনার ফোনের অপেক্ষায় আছে।

কেন কি হয়েছে ?

তেমন কিছুই হয়নি, ভয়ের কিছু নেই।

তবে!

আমি বাবাকে ফোন করে সব জানিয়েছি, কিন্তু বাবা আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইছেন না।

ও আচ্ছা এই কথা।

আপনাকে তাই ফোন করতে বলেছে।

আচ্ছা আমি এখুনি ফোন করছি। তার আগে আমার ভালো করে জানতে হবে তুই যা বলছিস তা কতটুকু নির্ভরযোগ্য!

তার মানে আপনিও কি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না?

না ঠিক তাও বলছি না, তবে এতদিনের একটা কঠিন রোগ হঠাৎ করে ভালো হয়ে গেল।

আপনি কি আমাকে দেখেও বুঝতে পারছেন না?

দেখে তো আগের চেয়ে অনেকটা সুস্থ মনে হচ্ছে তোকে।

আমার শরীরের অবস্থা আমার চেয়ে ভালো কে বলতে পারবে? আপনি এখুনি বাবাকে ফোন করে বলে দিন আমার কথা। আমি চাই না বাবা আমাকে নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করেন।

লাঞ্চ করে নেই। তারপর ফোন করছি।

তারপর আমরা দু'ভাই মিলে একসাথে লাঞ্চ করলাম। অনেকদিন পর আমরা একই খাবার একসাথে তৃপ্তি সহকারে খেলাম।

মেজ ভাই বললেন, এইসব লোভনীয় খাবার তোকে ছেড়ে খেতে আমার খুব খারাপ লাগত। যাক আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তিনি সবই করতে পারেন!

মেজ ভাই খাওয়া শেষ করে বাবাকে ফোন করে সব জানালেন। বাবাও আমার সাথে কথা বলে অনেক দোয়া করলেন। আমার সাথে একমত হয়ে বললেন, আবহাওয়া বদলের কারণে হয়তো এমনটা হয়েছে। সেই সাথে অনেক উপদেশ দিয়ে বললেন, বাইরে যেন আর আগের মতো খোলা আজেবাজে খাবার না খাই। আমিও বললাম, না বাবা আল্লাহ আমাকে একটি সুযোগ দিয়েছেন। আমি আর কখনোই এমনটি করব না। তুমি আমাদের দোয়া কর যেন ঠিকমতো সহিসালামতে দেশে গিয়ে পৌঁছতে পারি।

যাইহোক, সেদিন আর আমাদের কোথাও যাওয়া হয়নি। সোজা রুমে গিয়ে বিশ্রাম।

আমরা কাবুলে প্রায় ২২ দিন কাটালাম। আমাদের পাসপোর্ট ভিসা হতে এত সময় লেগে গেল, তার বিশেষ কারণও ছিল। আমরা শুধু ৩৮ জন বাঙালি কাবুলে ছিলাম না। আমাদের আগেও অনেক বাঙালি কাবুলে এসে আশ্রয় নিয়েছে তাদেরও ভিসা-পাসপোর্ট করতে সময় লাগছিল। এই প্রক্রিয়ায় আমরা লম্বা লাইনের মধ্যে ছিলাম। দুই সপ্তাহ পার হওয়ার পর আমাদের কাবুলে আর ভালো লাগছিল না। কারণ এখানে চতুর্দিকে শুধু বরফ আর বরফ কোথাও বেড়ানোর জায়গা ছিল না। হোটেলে বসে থাকা আর বরফ দেখা ছাড়া কোনো কাজই ছিল না আমাদের। সুতরাং একঘেঁয়ে হয়ে গিয়েছিল জীবনটা।

অবশেষে একদিন আমরা পাসপোর্ট আর ভিসা হাতে পেলাম। কাবুল থেকে নয়া দিল্লি যাওয়ার ভিসা। সেই সাথে আমাদের প্লেনের টিকেটও দিয়ে দেয়া হল। আমরা আবার আমাদের লাগেজ গোছাতে লেগে গেলাম। নির্ধারিত সময়ে আমাদের হোটেল থেকে কাবুল বিমান বন্দরে নিয়ে যাওয়া হল। আফগান এয়ার লাইন এরিয়ানাতে করে আমাদের ভারতের দিল্লি বিমান বন্দরে নামিয়ে দেয়া হবে। এই যাত্রায় আমাদের সাথে ছিল ১৫ জন বাঙালি। তার মধ্যে ফ্যামিলি ছিল ৫টি। আমরা প্লেনে গিয়ে বসলাম। যথাসময়ে এরিয়ানা আকাশে উড়াল দিল। ভাগ্যক্রমে আমার আসন ছিল জানালার পাশে। জানালা দিয়ে নিচে কাবুল শহর দেখা যাচ্ছিল। আমি জানালা দিয়ে দেখার চেষ্টা করছিলাম। পাহাড় দিয়ে ঘেরা কাবুল শহর আমি একনজরেই তখন দেখতে পাচ্ছিলাম। সমগ্র শহরটাই মনে হল শুভ্রচাদর দিয়ে ঢাকা। তখনও গুঁড়ি গুঁড়ি তুষার পাত হচ্ছিল। প্লেনের জানালা দিয়ে দেখতে বেশ ভালোই লাগছিল। প্লেন যতই উপরে উঠছিল, কাবুলের শুভ্র

পাহাড়গুলো ঝাপসা এবং ছোট হয়ে আসছিল। এভাবেই একসময় সব মিলিয়ে গেল। আড়াই শত যাত্রী বহনকারী আফগান এরিয়ানা দেখতে বেশ ছিল। প্লেন উড্ডয়নের ২০ মিনিট পরই আমাদের কফি এবং লাইট স্ন্যাক পরিবেশন করা হল। আমার পাশেই মেজ ভাই বসে ছিলেন। কফি আমার জন্য হারামস্বরূপ ছিল। আমি কফি পান করছি দেখে আমার পানে মেজ ভাই বারে বারে তাকাচ্ছিলেন। আমি মিটি মিটি হাসছিলাম। মেজ ভাইও তা দেখে মুচকি হেসে দিয়ে বললেন, আল্লাহ তোর দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। ভয়ের কিছু নেই। আমি আর তোকে বাধা দেব না। যা তোর ইচ্ছে খা। আমিও কিছু না বলে খেতে থাকলাম। এভাবে আমরা প্লেনে লাঞ্চ করলাম। আমাদের বিকেল ৫টায় ভারতের দিল্লি বিমান বন্দরে নামিয়ে দেয়া হল। বিমান বন্দরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের কিছু কর্মী। তারা আমাদের বিভিন্ন গেস্ট হাউজে নিয়ে গেলেন আবাসনের জন্য। আমি এবং মেজ ভাই দিল্লি শহরের সন্নিকটে অবস্থিত সুন্দর একটা সিমসাম গেস্ট হাউজে উঠলাম। গেস্ট হাউজের নিচে কিচেনের পাশেই খাবারের ব্যবস্থা ছিল।

এই গেস্ট হাউজে আমাদের সাথে আরও দুজন বাঙালি ছিল। তার মধ্যে একজন পরিবার নিয়ে আছেন। আফগানিস্তানে আমাদের সব ব্যয়ভার বহন করেছে ভারতীয় দূতাবাস। ভারতে যেহেতু বাংলাদেশ দূতাবাস রয়েছে তাই এবার বাংলাদেশ দূতাবাসের উপর ন্যস্ত হয়েছে আমাদের সব ব্যয়ভার। আমরা প্রায় ৭/৮ দিন ছিলাম এই গেস্ট হাউজে। তেমন কিছুই করার ছিল না। গেস্ট হাউজের কিছু টুরিস্ট গাইড ছিল। আমাদের বলেছিল সিটি ট্যুরের কথা। যেমন আগ্রার তাজমহল দেখার জন্য। আমাদের মধ্যে কাউকেই দেখলাম না তেমন উৎসাহিত। আমিও তেমন একটা উৎসাহিত ছিলাম না। কারণ আমাদের সবার মধ্যে তখন স্বাধীন বাংলাদেশ, আমার জন্মভূমি মায়ের দেশ দেখার যে ব্যাকুলতা ছিল হৃদয়ে। তার কাছে সমস্ত পৃথিবী ছিল তুচ্ছ। এত বড় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসার একমাত্র মূল লক্ষ্য তো আমার প্রিয় মাতৃভূমি। যার সাথে কোনো দেশের তুলনা চলে না। তাই অন্য কিছু দেখার বা উপলব্ধি করার কোনো অবকাশ ছিল না আমাদের মাঝে।

তবে আমাদের একদিন নিয়ে যাওয়া হয়েছিল দিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে। আমাদের সবার বাংলাদেশে প্রবেশ করার ইমিগ্রেশন ফরমালিটিজ সমাধান করার জন্য। সারাটা দিন ছিলাম আমরা বাংলাদেশ

দূতাবাসে। অনেক ভালো লাগার একটা সময় ছিল আমাদের। কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না, হৃদয়ে সবার একটা আনন্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। আমরা বাংলাদেশের কত কাছে চলে এসেছি। আর মাত্র ক'টা দিন। তারপর বাংলার আকাশ, বাংলার বাতাস, বাংলার মাটি– ভাবতেই আনন্দে সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আবার যখন ভাবি, ত্রিশ লক্ষ শহিদের বিনিময়ে আজকের এই স্বাধীন বাংলাদেশ যারা দেখে যেতে পারল না, স্বাধীনতার আস্বাদ নিতে পারল না, শুধুই ত্যাগ স্বীকার করে চলে গেল আমাদের জন্য, তাদের কথা মনে পড়তেই চোখ ভিজে যায়। মনে পড়ে স্বাধীনতার পরবর্তী কালজয়ী গানের কথা। 'তোমাদের এই ঋণ কোনোদিন শোধ হবে না' 'যে মাটির বুকে ঘুমিয়ে আছে লক্ষ মুক্তিসেনা' 'সালাম সালাম হাজার সালাম সকল শহিদ স্মরণে' আরও কত গান কবিতা! আমি মনের অজান্তেই হঠাৎ করে ভীষণ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম।

মেজ ভাইয়ের ডাকে আমার সম্বিৎ ফিরে এল।

কিরে কি ভাবছিস!

দেশের কথা ভাবছি।

হুম! দেশের অনেক কাছে চলে এসেছি, চিন্তাভাবনার দিন শেষ।

কবে যাব দেশে কিছু জানতে পারলেন ভাই?

কাল পরশু এখান থেকে কলকাতার শিয়ালদহ রওয়ানা হব ইনশাল্লাহ।

তাহলে তো বেশ ভালো খবর, আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে না

আরে এত উত্তেজিত হবার কারণ নেই। এতটা পথ যখন পেরিয়ে এসেছি, আল্লাহ যখন আমাদের সব বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত করেছেন, এই সামান্য পথটুকুও ইনশাল্লাহ পার হয়ে যাব।

তাই যেন হয় ভাই।

আমার তো বড় ভয় ছিল তোকে নিয়ে। সেটা যখন কেটে গেছে আর চিন্তা কি বল?

আমি হেসে বললাম, এটাও আল্লাহর একটা লীলাখেলা।

কি জানি কি খেলা, তবে বাবা একটা ভীষণ দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই পেয়েছেন, এটাই বড় বিষয়।

ঠিকই বলেছেন। বাবা ভীষণ দুশ্চিন্তায় ছিলেন।

আমাদের ইমিগ্রেশনের ফর্মালিটিজ শেষ হয়েছে।

এই যে দেখছিস না লাইনে দাঁড়িয়ে আছি —

কতক্ষণ লাগতে পারে?

আরও ঘণ্টা দুই লাগতে পারে। মেজ ভাই উত্তর দিলেন।

আমরা সকাল ১০টার দিকে এসেছিলাম দূতাবাসে। এখন বাজে বিকেল ৩টা। আমার ক্ষুধাও লেগেছিল। এদিকে বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে আমাদের প্রতি বাংলাদেশিকে ১০০ ইন্ডিয়ান রুপি দেয়া হয়েছিল। আমরা সেখান থেকে কিছু খরচ করে এটাসেটা খেয়েছি। বিকেল ৫টার মধ্যে আমরা ইমিগ্রেশনের কাগজপত্র নিয়ে গেস্ট হাউজে ফিরে গেলাম। এবং গেস্ট হাউজেই ডিনার করলাম।

পরের দিন যে যার মতো করে তৈরি হয়ে নিলাম দিল্লি থেকে কলকাতা যাবার জন্য। দিল্ল থেকেই আমাদের পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা বাঙালির দলটি ভেঙ্গে গেল। কারণ সবাই তখন বাংলাদেশে যাবার লিগাল পেপার হাতে পেয়ে গেছে। তাই যে যার সুবিধামতো দেশে পাড়ি জমাচ্ছে। তবে কিভাবে কোনো পথে বাংলাদেশে যেতে হবে সেটা বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে আমাদের সবাইকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। আমরাও পরের দিন সকালে গেস্ট হাইজ ছেড়ে দিল্লি ট্রেন স্টেশনে গিয়ে পৌঁছলাম। মেজ ভাই কলকাতা শিয়ালদহগামী ট্রেনের দুটো টিকেট কেটেছে। স্টেশনে তেমন বেশি যাত্রী ছিল না। আমরা ৩৫/৪০ মিনিট স্টেশনে বসে ছিলাম। দিল্লি ট্রেন স্টেশন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মনে হল। এমন সময় ঘট ঘটাং ঘট ঘটাং করে বিশাল লম্বা ট্রেন, স্টেশনের প্লাটফর্মে এসে থামল। আমরা দু'ভাই একটা কম্পারটমেন্টে গিয়ে উঠলাম আমাদের লাগেজ নিয়ে। বসার সিটও পেয়ে গেলাম সহজেই। যথাসময়ে ট্রেন বিকট হুইসেল বাজিয়ে ছেড়ে দিল। ঝিক ঝিক ঝিক ঝিক ট্রেন ছুটে চলল কলকাতার পানে।

ঘণ্টা চারেক পর আমরা বুঝতে পারলাম, আমরা একটা লোকাল ট্রেনে উঠেছি! কারণ প্রতিটা স্টেশনেই ট্রেন থামছে। আর প্রতিটা স্টেশন থেকেই যাত্রী উঠছে। এক সময় আমাদের কম্পারটমেন্ট যাত্রীতে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। কিছু যাত্রী দাঁড়িয়েও রয়েছে সিট না পেয়ে। দু একটি যাত্রীর সাথে আলাপ করে জানতে পারলাম, এই ট্রেনটির লাস্ট স্টপ হল শিয়ালদহ। দিল্লি থেকে দু'দিনের মতো লাগবে শিয়ালদহ পৌঁছতে। মেজ ভাই মাথায় হাত দিয়ে বললেন, হায়রে এটা আমি কি করলাম! কেন যে এক্সপ্রেস লাইনে টিকেট না করে লোকালে টিকেট করলাম!

আমি বললাম, এখন আর এসব ভেবে মন খারাপ করে লাভ নেই ভাই।

হুম তা ঠিকই বলেছিস।

কষ্ট তো কম করলাম না। সুতরাং এই কষ্টও মাথা পেতে নিলাম।

তাই বলে দুই দিন এখানে এইভাবে বসে থাকতে হবে!

কি আর করা, উপায় তো আর নেই।

পরবর্তী স্টেশনে তুই বসে থাকিস, আমি নেমে গিয়ে কিছু খাবার নিয়ে আসব।

সাবধানে যেও, দেখেছ তো যতই কলকাতার দিকে যাচ্ছি, মানুষের ভিড় ততই বাড়ছে।

হুম আমার সিটে কাউকে বসতে দিস না যেন –

আরে না সেটা ভেব না, কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেব কেউ দখল করতে চাইলে।

কথামতো মেজ ভাই পরবর্তী স্টেশনে নেমে গিয়ে কলা রুটি ও বয়েল ডিম নিয়ে এলেন। আর চা আমরা সিটে বসেই পেলাম। প্রতি স্টেশনে হকার দেখা মেলে। তারা চা, সিগারেট, খবরের কাগজ নিয়ে হাঁকডাক শুরু করে দেয়। অনেকে আবার কোকা কোলা, সেভেন আপ নিয়ে ওঠে। প্রতি স্টেশনে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। বিভিন্ন হকারের বিভিন্ন সুরে তাদের মাল বিক্রির যে প্রক্রিয়া দেখে শুনে বেশ ভালোই লাগছিল। শত শত যাত্রীরা ওঠা-নামা করে, নানান ভাষায় কথা বলা, নানান রকমের পোশাক-আশাক। এদের মধ্যে কেউ মারাঠি, কেউ গুজরাটি, কেউ তামিল, কেউ আসামি, কেউ বিহারি, কেউ পাঞ্জাবি আবার কেউ বা বাঙালি। তবে কোনো বাঙালি তখনো আমার চোখে পড়েনি। ভারতে বহু জাতের বহু ভাষার মানুষ বাস করে। তারপরেও তারা একই দেশের বাসিন্দা ভাবতে অবাক লাগে। তবে বেশির ভাগ মানুষই হিন্দি কথা বলে বা বোঝে। উর্দু আর হিন্দির মধ্যে খুব বেশি একটা পার্থক্য নেই। যে উর্দু বলতে পারে বা বোঝে সে হিন্দি কথাও কিছুটা বুঝবে বা বলতে পারবে। তাই যেহেতু আমি উর্দু বলতে পারি, হিন্দি বলা বা বোঝা আমার জন্য তেমন বড় কোনো সমস্যা হয়নি। তা ছাড়া হিন্দি, বাংলা ভাষার সাথেও কিছুটা মিল রয়েছে। সুতরাং ভাষা নিয়ে আমরা তেমন উদ্বিগ্ন ছিলাম না।

এভাবেই একটি দিন অতিবাহিত হয়ে গেল ট্রেনে বসেই। ট্রেন ঠক্কুর ঠাক্কুর করে থামছে আর চলছে। আর আমরা ডিম রুটি খেয়ে সময় কাটাচ্ছি। প্রথম দিনটা ভালোই কেটে গেল কিন্তু পরের দিনটার সময় যেন পার হতে চাচ্ছে না। ভীষণ অস্থির লাগছিল। কখন যে শিয়ালদহ গিয়ে

পৌছাব! মনটা কিছুতেই স্থির থাকতে চাইছে না। তবে যখন ভাবি আমরা তো বাংলাদেশের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছি তখন আবার মন কিছুটা শান্ত হয়। পরের দিন সকাল ১০টায় আমরা চা বিস্কুট খাচ্ছি ট্রেনে বসেই। চোখের সামনে কত মানুষ ট্রেনে ওঠে আর নেমে যায় আর আমরা বসে আছি তো আছি! কখন আমাদের গন্তব্যস্থল আসবে কে জানে। ট্রেন চলতে না চলতে আরেকটি স্টেশনে এসে থামল। যথারীতি যাত্রী নামছে আর উঠছে। এমন সময় কানে ভেসে এল খাঁটি বাংলা কথা।

বললুম না রাধা, পরের ট্রেনটাতে উঠি? দেখেচ কি ভিড়?

তাই তো দেকচি। বসার কোনো সিট নেই!

এভাবেই দাঁড়িয়ে যেতে হবে দুটো ঘণ্টা।

হায় ভগবান, এখন কি হবে?

দেখি পরের স্টেশনে সিট খালি হয় কিনা।

মধ্য বয়সী স্বামী-স্ত্রী সাথে ৭/৮ বছরের একটা ছেলে। তাদের কথোপকথন শুনছিলাম। মহিলার মাথায় সিঁদুর দেয়া, বিশাল বড় একটা ঘোমটা, গায়ের রং ফর্সা। ভদ্রলোক, শ্যাম বর্ণ, পরনে একটা ঢোলা প্যান্ট আর পাঞ্জাবি। ট্রেন আবার চলতে শুরু করেছে। ট্রেনের মৃদু ঝাঁকুনিতে মহিলাটি মাঝে মাঝে বেসামাল হয়ে যাচ্ছিলেন। একহাতে ছেলেটিকে ধরে রেখেছেন, অন্য হাতে তার স্বামীর হাত ধরে রেখেছেন। বেশ কিছুক্ষণ এভাবেই কাটল। আমার সামনেই তারা দাঁড়িয়ে ছিল। যাত্রীদের চলাফেরায় ধাক্কাধাক্কিতে তাদের কিছুটা নাজেহাল হতেও দেখেছি। এ সব দেখে আমার মোটেই ভালো লাগছিল না। আমার বিবেকের তাড়নায় আমি উঠে দাঁড়ালাম। মেজ ভাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কিরে উঠে দাঁড়ালি যে! বাথরুমে যাবি নাকি ?

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোককে সবিনয়ে বললাম, আপনার যদি কোনো আপত্তি না থাকে আপনার স্ত্রীকে এখানে বসতে বলতে পারেন। ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি বাঙালি!

জী আমি বাংলাদেশি বাঙালি।

লোকটি কিঞ্চিত মুচকি হেসে বললেন, ও আচ্ছা, আপনি কি নেমে যাবেন পরের স্টেশনে ?

না আমার নামতে দেরি আছে। একেবারে লাস্ট স্টপে নামব।

তবে সিট ছেড়ে দিলেন যে! একটু অবাক হয়ে লোকটি জিজ্ঞেস করল আমাকে।

আমি বললাম, আমার সম্মুখে আপনার স্ত্রী এভাবে দাঁড়িয়ে কষ্ট করবে আর আমি বসে থাকব, কেন জানি আমার মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। তা ছাড়া অনেকক্ষণ ধরেই তো বসে আছি। লোকটি এবার কৃতজ্ঞতা মিশ্রিত কণ্ঠে বলল, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন এই বলে তিনি তার স্ত্রীকে আমার স্থানে বসতে বললেন। মহিলাটি আড়চোখে আমার দিকে একবার তাকিয়ে একটু ইতস্তত হয়ে বসে পড়ল। আর ছেলেটিকে তার কোলে বসিয়ে দু'হাতে তাকে জড়িয়ে রাখল।

কেন জানি না কাউকে উপকার করতে পারলে বা আমার দ্বারা কারো উপকার হলে নিজেকে ভীষণ হিরো মনে হয়। হয়তো অনেকের মধ্যেই এই বিষয়টা কাজ করে। মেজ ভাই কোনো কিছু বললেন না। শুধু আমার দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছিলেন। আমিও এই ফাঁকে ট্রেন কম্পারটমেন্টের ভিতরে ভিড় ঠেলে ঠেলে একটু হাঁটাহাঁটি করে নিলাম। আমি জানি লোকটি বলেছিল, তাদের গন্তব্যস্থলে পৌছাতে দু ঘণ্টা লাগবে। তার মধ্যে প্রায় এক ঘণ্টা তো চলেই গেল। আর একটি ঘণ্টা মাত্র। আমি ঘুরেফিরে আবার আমার সিটের কাছে চলে এলাম। এবার মেজ ভাই বলল, তুই বোস আমার সিটে আমি না হয় একটু হেঁটে আসি। এই বলে মেজ ভাই তার সিট আমাকে দিয়ে হাঁটতে গেল। আমার পাশে সেই মহিলাটি তখনো তার বিশাল ঘোমটা দিয়ে বসে আছে। আমি তার পাশে বসাতে সে মাঝে মাঝে মাথা ঘুরিয়ে আড়চোখে আমাকে দেখছিল। আর তার স্বামী বেচারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ট্রেনের উপরের রড ধরে ঝিমুচ্ছে। এভাবেই আরও একটি ঘণ্টা অতিবাহিত হল। মেজ ভাই ইতোমধ্যে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় ট্রেন হুইসেল বাজিয়ে জানিয়ে দিল পরবর্তী স্টেশনের কথা। অনেকেই নড়েচড়ে বসল। কেউ আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেল। হয়তো এই স্টেশনেই নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ট্রেন দু-একটা মৃদু ঝাঁকি দিয়ে স্টেশনে থেমে গেল। তারপর শুরু হল কে কার আগে নামবে তার প্রতিযোগিতা। আমার পাশে ঘোমটা দেয়া সেই মহিলা আর তার বাচ্চাকে নিয়ে তার স্বামী কখন যে ট্রেন থেকে নেমে পড়েছে আমি বুঝতেই পারিনি। মেজ ভাই যখন আমার পাশে এসে ধপাস করে বসে পড়ল ঠিক তখনি বুঝতে পারলাম মহিলা আমার পাশে নেই। যাক, আমি ট্রেন না ছাড়া পর্যন্ত ট্রেনের জানালা ধরে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। শত শত যাত্রীর ভিড়ে আমিও যেন কোথায়

হারিয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ ট্রেনের ঝাঁকুনিতে আর কান ঝাঁঝানো হুইসেলে আমার সম্বিত ফিরে এল।

ট্রেন আবার চলতে শুরু করল। বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ট্রেনের যাত্রী সংখ্যাও কিছুটা কম ছিল এবার। দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রী ছিল না বললেই চলে। রাত যত গভীর হচ্ছিল যাত্রীও কমে যাচ্ছিল। এক পর্যায়ে আমার পাশের সিটও খালি হয়ে গেল। আমি এই সুযোগে একটু সহজ হয়ে পা-টা মেলে দিয়ে বসলাম।

মেজ ভাই বললেন, তুই হাতের ব্যাগটা মাথায় দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নে। আমি জেগে আছি।

আমারও অবশ্য চোখে তন্দ্রা নেমে আসছিল। আমি বললাম, আপনার ঘুম পাচ্ছে না ?

হুম, পাচ্ছে, তবে দুজনে একসাথে ঘুমানো ঠিক হবে না।

হুম, ঠিক বলেছ।

তুই কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নে, তারপর না হয় আমি ঘুমাব।

ঠিক আছে। এই বলে আমি ঘুমানোর চেষ্টা করলাম।

ট্রেনের ঝিকিঝিকি শব্দ আর দোলাতে বেশ ভালোই লাগছিল। তন্দ্রা থেকে ঘুমের রাজ্যে যেতে আর বিলম্ব হল না। কতক্ষণ ঘুমালাম তা বলতে পারব না। ট্রেন থামার ধাক্কা আর হুইসেলে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। পাশ ফিরে দেখি মেজ ভাইও বসে বসে ঝিমুচ্ছে।

তুমি এখন একটু ঘুমিয়ে নাও।

কিরে এরি মধ্যে জেগে গেলি!

হুম ভালোই ঘুমাচ্ছিলাম, ট্রেনটা ধাক্কা মেরে জাগিয়ে দিল।

ঠিক আছে, তুই তাহলে উঠে বস, আমি একটু ঘুমিয়ে নেই।

এইভাবে দু'ভাই পালা করে ঘুমিয়ে সেই রাতটা পার করলাম।

পরের দিন সকাল হতে না হতেই শুরু হয়ে গেল আবার সেই যাত্রীদের হৈ হুল্লোর চেঁচামেচি। আর হকারদের নানা পণ্য নিয়ে হাঁকডাক।

মেজ ভাই বললেন, পরবর্তী স্টেশনে মুখহাত ধুয়ে নিস, আমি ডিম রুটি নিয়ে আসব।

আরে না, আর ডিম রুটি নয় ভাই।

কেন, কি হয়েছে!

এই দুদিন ধরে তো ডিম রুটির উপরেই আছি, অন্য কিছু নিয়ে আসেন।

ট্রেন স্টেশনে এসব ছাড়া আর কি আছে?

তবুও চেষ্টা করেন নতুন কিছু আনার।

আচ্ছা দেখি যদি তেমন কিছু পাই।

ট্রেন আবার একটা ঝাঁকি দিয়ে পরবর্তী স্টেশনে থামল। আমি বোতলের পানি দিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নিলাম। মেজ ভাই তড়িঘড়ি করে ট্রেন থেকে নেমে নতুন কিছুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর মেজ ভাই গরম গরম অমলেট আর পরোটা নিয়ে ট্রেনে উঠল। আমি তো ভীষণ খুশি। কাল বিলম্ব না করে দু'ভাই মিলে তৃপ্তি সহকারে খেলাম।

চায়ে গারাম গারাম চায়ে।

চা নিয়ে হকার সময়মতোই আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। দু'ভাই দু'কাপ চা নিয়ে মজা করে পান করলাম। মনে হল এই দু'দিন পর যেন একটু ভালো খেলাম।

আর কিছু খেতে চাস, ভাই শুধালেন।

যা খাওয়ালেন, ৪/৫ ঘণ্টা তা পেটে থাকবে।

আমার কথা শুনে মেজ ভাই মিটমিট করে একটু হাসলেন।

অনেক দূর থেকে নিয়ে এসেছি, স্টেশনের ভিতর ভালো তেমন কোনো রেস্তরাঁ নেই, মেজ ভাই বললেন। হুম আমি তো রীতিমতো ভয় পাচ্ছিলাম, কোথায় কতদূরে গিয়ে আপনি না আবার ট্রেন মিস করেন!

সেই জন্যই তো আমি ছুটে গিয়েছিলাম।

ট্রেন আবার চলতে শুরু করল। সেই একই তাল, লয় আর সুর।

খটা খট খটা খট ঝিকি ঝিকি ঝিকি ঝিকি।

শুনতে লাগে মিষ্টি মধুর।

সময় তবু কাটে না আর।

কলকাতা তুমি কতদূর...!

একটা বিষয় আমি খেয়াল করলাম। সকাল থেকে যতগুলো স্টেশনে ট্রেন থামছে, বাঙালি যাত্রীর আনাগোনা ততই বাড়ছে। বিষয়টা আমি মেজ ভাইয়ের সাথে শেয়ার করলাম। মেজ ভাই বললেন, বুঝতে পারছিস না আমরা কলকাতার কাছাকাছি চলে এসেছি।

ও তাই এত বাংলা কথা শোনা যাচ্ছে।

আনন্দে আমার মন উদ্বেলিত হয়ে উঠল। অপেক্ষার পালা প্রায় শেষের পথে। আমি অতি উৎসাহিত হয়ে একজন বাঙালিকে জিজ্ঞেস করলাম, দাদা শিয়ালদহ আর কটা স্টেশন পর ?

একটা স্টেশন পর। তিনি উত্তর দিলেন।

মাত্র একটা স্টেশন পর! আমি অবাক হয়ে বললাম।

আপনি কোথা থেকে আসছেন ? জনৈক যাত্রী আমাকে প্রশ্ন করলেন।

দিল্লি থেকে। আমি বললাম।

ও...অনেক দূর থেকে আসছেন। দু'দিন লেগে যায় দাদা।

এক পর্যায় দেখলাম ট্রেনের বগিতে বেশির ভাগই বাঙালি। মেজ ভাই বললেন, কলকাতা আসা মানে বাংলাদেশের বর্ডারের কাছে চলে আসা।

তাহলে তো চলেই এসেছি। আমি বললাম।

আর মাত্র একটা স্টেশন। মেজ ভাই খুশিতে আত্মহারা হয়ে বললেন।

অবশেষে লোকাল ট্রেন আমাদের কাঙ্ক্ষিত কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশনে এসে পৌঁছাল বেলা ১১টার দিকে। ট্রেনের জানালা দিয়ে দেখলাম, শিয়ালদহ স্টেশন যেন জনসমুদ্রের শামিল। লোকে লোকারণ্য। ট্রেন থামার সাথে সাথে ৮/১০ জন কুলি এসে আমাদের লাগেজ নিয়ে শুরু করল টানাটানি। একি বিপদ, যতই বলি আমাদের কুলি প্রয়োজন নেই, কে কার কথা শোনে। আমরা আমাদের লাগেজ ধরে না রাখলে ওরা তো টেনেহিঁচড়ে প্রায় নিয়েই চলে যাচ্ছিল। মেজ ভাই অনেকটা ধমকের স্বরে বললেন, খবরদার! এই লাগেজে কেউ হাত লাগাবে না। তারপরেই ওরা আমাদের লাগেজ ছেড়ে অন্যদিকে চলে গেল। মেজ ভাই আমাকে বললেন, চুপ করে এখানেই লাগেজ ধরে বসে থাক। এটা লাস্ট স্টপ। সুতরাং ট্রেন এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়াবে। বগির ভিড়টা একটু কমে যাক। তারপর আমরা বেরুব।

প্রায় ১৫ মিনিট সিটেই বসে ছিলাম। ধীরে ধীরে ভিড় কমতে শুরু করল। এরপর আমরা সুবিধামতো প্লাটফর্মে নামলাম। প্লাটফর্মে দাঁড়াতেই দেখি ২/৩ জন ট্যাক্সি ড্রাইভার এসে হাজির।

ওরা বাংলাদেশিদের দেখলেই চিনতে পারে।

দাদা বেনাপোল যাবেন তো, আসুন আমার ট্যাক্সিতে।

আমার ট্যক্সিতে আসুন দাদা ভাড়া কমিয়ে রাখব।

দাদা ওর ট্যাক্সি পুরনো। আমারটায় আসুন, একেবারে নতুন।

এই শালা তুই আমার কাস্টোমার নিচ্চিস কেনে?

ট্যাক্সি ড্রাইভাররা নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া শুরু করে দিল। মেজ ভাই বললেন, নতুন পুরনো বুঝি না, যে ভাড়া কম নেবে তার ট্যাক্সিতেই যাব।

প্রথম ট্যাক্সি ড্রাইভার সাথে সাথে বলে উঠল, ২০০ টাকা দেবেন দাদা একদম বর্ডারের কাছে গিয়ে বাংলাদেশের গাড়ি ঠিক করে দেব। ওই শালাদের কথা শুনবেন না।

মেজ ভাই রাজি হয়ে গেলেন। অতঃপর লাগেজ নিয়ে তার ট্যাক্সিতে উঠালাম। আমি ভাইকে বললাম, দুপুরের খাবার খেয়ে নিলে হত না?

হুম আমারও তাই মনে হয়।

দাদা রাওয়ানা করার আগে কিছু খেয়ে নিতে চাই, আমি ড্রাইভারকে বললাম।

কি খেতে চান বলুন।

খাঁটি বাঙালি খাবার, মাছ ভাত আমি বললাম।

ঠিক আছে দাদা, গাড়িতে বসুন আমি নিয়ে যাচ্ছি।

তারপর ড্রাইভার আমাদের রেস্তোরাঁ পাড়ায় নিয়ে গেল। ড্রাইভারের পছন্দমতো একটা ভালো রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসলাম খেতে।

শিয়ালদহ শহর তেমন পরিষ্কার শহর নয়। রেস্তোরাঁ গুলোও তেমন পরিষ্কার নয়। দিল্লির তুলনায় অনেকটাই নোংরা শহর বলা চলে। অগণিত মানুষের ভিড় শহরে। ড্রাইভার আমাদের সাবধান করে দিয়ে বলেছিল, দাদা একটু সাবধানে চলবেন, এখানে অনেক চোর, বাটপার আছে। আপনাদের দেখলেই চেনা যায় আপনারা এই শহরের নন তাই একটু সাবধানে থাকবেন।

আমরা কিছুটা হলেও বুঝতে পারছিলাম, আমাদের পানে লোকজন যেভাবে তাকাচ্ছিল তাতে মনে হল, আমরা কোনো চিড়িয়াখানার চিড়িয়া! আমরা খাবার টেবিলে বসতেই বেয়ারা এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল।

বলুন দাদা কি খাবেন ?

ভালো ফ্রেশ খাবার কি আছে ? মেজ ভাই বললেন।

ডাল, ভাত, রুই মাছ, কাতল মাছ, চিংড়ি, মাছের, পালং শাক, আলু, বেগুন, পটল, ভাজি। এক দমেই সব বলে ফেলল বেয়ারা।

কোনো মাংস নেই ?

আছে দাদা, মুরগির মাংস।

খাসির মাংস আছে ? আমি জিজ্ঞেস করলাম। কারণ খাসির মাংস আমার ভীষণ প্রিয়। জী দাদা আছে ফ্রেশ জল খাসি বেয়ারা বলল।

আমি জল খাসি মানে ধরে নিয়েছি খাসি। তাই কথা না বাড়িয়ে মেজ ভাইকে বললাম, আপনি যা খুশি অর্ডার দিন। আমার জন্য শুধু বাড়তি

খাসির মাংসটা রাখবেন। বেয়ারাকে সেইভাবে অর্ডার দেয়া হল। টেবিলে এসে উপস্থিত হল ভাত ডাল, রুই মাছ, চিংড়ির পালং শাক আর আমার খাসির মাংস। প্রচণ্ড ক্ষুধা ছিল আমাদের। নিমিষেই সব খাবার আমরা দু'ভাই শেষ করে ফেললাম। তারপর বিল পরিশোধ করে বেরিয়ে যাবার সময় আমার চোখে পড়ল রেস্তোরাঁর ক্যাশ কাউন্টারের পিছনে বড় করে লাগানো খাবারের তালিকা ও তার মূল্য। প্রত্যেকটি খাবারের পাশে সেই খাবারের ছবি লাগানো আছে। রেস্তোরাঁয় ঢোকার সময় সেটা চোখে পড়েনি আমাদের কারণ তখন ছিল প্রচণ্ড ক্ষুধা। হঠাৎ করেই আমার দৃষ্টি পড়ল জল খাসি লেখা ছবির দিকে। আমি সাথে সাথে মেজ ভাইকে ডাকলাম। মেজ ভাই ইতোমধ্যে বাইরে চলে গিয়েছিলেন। কিরে কি হয়েছে, ডাকলি কেন ? বলতে বলতে মেজ ভাই আবার ফিরে এলেন।

খাবারের মেন্যুটা একবার দেখ।

কি আছে তাতে!

আরে দেখই না জল খাসির ছবিটা।

মেজ ভাই ছবিটা দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন!

আরে ওটা কি!

কি আবার, দেখতে পাচ্ছ না!

ওটা তো রীতিমতো একটা কচ্ছপ!

হ্যাঁ, কিন্তু খাসি আবার কচ্ছপ হয় কি করে!

শুধু খাসি নয়রে বোকা, ওখানে লেখা আছে জল খাসি!

জল খাসি মানে কচ্ছপ হবে কেন!

আমি রেস্তোরাঁর ম্যানেজারকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, জল খাসি মানে আপনি আমাদের কচ্ছপ খাইয়েছেন !

হুম দাদা, আপনি তো সেটাই চাইলেন! ম্যানেজার বলল।

আমি এবার সত্যিই বোকা বনে গেলাম। আমি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি জল খাসি মানে কচ্ছপ! আর ক্যাশ রেজিস্টারের পিছনের বোর্ডে বড় করে ছবিসহ লেখা রয়েছে। আমি ম্যানেজারকে দোষ দেই কি করে! আমি চুপচাপ বোকার মতোই রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে গেলাম।

আমাকে দেখে মেজ ভাইয়ের সেকি হাসি। মেজ ভাইয়ের হাসি দেখে আমার গা জ্বলে যাচ্ছিল। খাসি মনে করে কচ্ছপ খেয়ে এসেছি, অথচ একটুও বুঝতে পারলাম না, যতবার এই কথা ভাবি ততবারই যেন আমার বমির উদ্রেক হয়। কোনো রকম মুখ চেপে ট্যাক্সিতে গিয়ে বসলাম। মেজ

ভাই তখনো হেসেই চলেছেন। আমি ভাইকে বললাম, আপনি এমন করলে আমি কিন্তু আপনার গায়েই বমি করে দিতে পারি।

আরে না না, কি বলছিস! তুই ওসব কথা মোটেও মাথায় আনিস না। মনে কর তুই খাসির মাংসই খেয়েছিস।

তুমি দয়া করে হাসি বন্ধ করবে? এত হাসির কি আছে, তুমিও তো খেয়েছ?

তোর কথায় খেয়েছি! এবার মেজ ভাই একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

ট্যাক্সি ছুটতে শুরু করেছে। বেশ কিছুক্ষণ আমরা চুপচাপ নীরবে কাটিয়ে দিলাম। কারো মুখে কোনো কথা নেই। হঠাৎ করে আমি নীরবতা ভঙ্গ করে বললাম, খেয়েছি তো কি হয়েছে। খেতে তো খারাপ লাগেনি। অনেকটা খাসির মাংসের মতোই লেগেছে। তোমার কেমন লেগেছে ভাইয়া! সত্যি করে বল? আমি পরিবেশটা একটু হাল্কা করার চেষ্টা করলাম।

মেজ ভাই খিক খিক করে আবার হেসে উঠে বললেন, তোর ভালো লেগেছে সেটাই বড় বিষয়, আমার কথা তোর ভাবতে হাবে না।

তবে একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে গেলাম, কলকাতায় কচ্ছপকে জল খাসি বলে।

ট্যাক্সি ছুটে চলেছে যশোর বেনাপোলের দিকে। রাস্তার দু'পাশে সবুজ গ্রাম দেখে আমার ভীষণ ভালো লাগছিল। রাস্তাও মোটামুটি ভালো। আমি মাথা ঘুরিয়ে রাস্তার এপাশ ওপাশ দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, কত না বিপদ মাথায় নিয়ে এই পর্যন্ত আসতে হয়েছে। একমাত্র মাতৃভূমির মায়ের টানে আমরা কোনো বিপদ গ্রাহ্য করিনি। কত বাঙালি এই দুর্গম পথে তাদের সর্বস্ব হারিয়ে প্রাণ দিয়েছে নিজের মাতৃভূমি বাংলাদেশে আসার জন্য। অথচ পাকিস্তান সরকার পরবর্তীতে বাঙালিদের জন্য ঘোষণা দিয়েছিল, যদি কোনো বাঙালি পাকিস্তানে অবস্থান করতে চায় তারা করতে পারবে এবং সরকারের সব ধরনের নাগরিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবে। কিন্তু আমার জানামতে দেশপ্রেমিক সব বাঙালি পাকিস্তানের সেই ঘোষণাকে অগ্রাহ্য করে চলে এসেছে নিজের দেশ বাংলাদেশে।

আমরা পালিয়ে আসার এক বছর পর ১৯৭৪-এ বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে একটা বিনিময় চুক্তি হয়েছিল। সেই সময় অনেক বাঙালি বাংলাদেশে ফেরত এসেছে।

আমরা দিল্লি পর্যন্ত আসার পর বাবাকে ফোন করে জানিয়েছিলাম, পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসাটা খুব একটা সহজ কাজ নয়। পথিমধ্যে সব

ঘটনা বাবাকে কিছুটা বর্ণনা করেছিলাম। ইতোমধ্যেই বাবা আমার বাকি তিন ভাইকে নিয়ে পালিয়ে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আমি মেজ ভাই তখন বাবাকে বারণ করেছিলাম, কারণ আমরা যে কষ্ট সহ্য করে এসেছি বাবা হয়তো তা করতে পারবেন না। বাবাকে বলেছিলাম আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে, যদি বিনিময়ের কোনো ব্যবস্থা হয়। যদি একান্তই কিছু না হয় তখন না হয় জীবনের আরেকটি ঝুঁকি নেয়া যাবে। সৌভাগ্যবশত পরের বছরেই বিনিময় শুরু হয়েছিল। বাবা যদি জানতেন এত তাড়াতাড়ি বিনিময় শুরু হবে তবে হয়তো আমাদের এভাবে আসতে দিতেন না। তখন হয়তো এই লোমহর্ষক কাহিনীও লিখতে পারতাম না। একদিকে ভালোই হল, সত্যি ঘটনার উপর একটা গল্প লেখা হল। কেউ যদি চলচ্চিত্র বানাতে চায় আমার এই গল্প নিয়ে, ছবি শুরু হবার আগে লেখা থাকবে, 'সত্যি ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত' আর যদি হলিউডে নির্মিত হয়, লেখা থাকবে, 'বেইজড অন ট্রু স্টোরি'। এলোমেলো ভাবনায় আমার মন যখন অন্য পৃথিবীতে ঠিক তখনি জনাব ড্রাইভার আমার বাড়া ভাতে ছাই ঢেলে দিল।

দাদা বেনাপোল প্রায় এসে গেলাম, আর মাত্র ১০/১৫ মিনিট।

আমাদের কোথায় নামাবে!

বর্ডারের সাথেই একটা চেকপোস্ট আছে, সেখানে।

টাকা পয়সা কিছু দিতে হবে নাকি আবার!

না, টাকা পয়সা কিছুই দিতে হবে না, শুধু পাসপোর্ট দেখালেই হবে।

এসে গেলাম যশোরের বেনাপোল সীমান্তে। ড্রাইভার আমাদের চেকপোস্টের সন্নিকটে নামিয়ে দিয়ে বলল, ঐ যে ওপারে গেলেই গাড়ি পাবেন দাদা।

আমরা আমাদের লাগেজ নামিয়ে ড্রাইভারকে বিদায় করে দিলাম। সীমান্তে দেখলাম আরও কিছু বাঙালি পারাপার হচ্ছে। আমি ভারত বাংলাদেশের সীমান্তে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম বাংলাদেশের দিকে। এই সেই বাংলাদেশ, ত্রিশ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে অর্জিত। আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম।

মেজ ভাইয়ের ডাকে সম্বিত ফিরে পেলাম। চেকপোস্টে গিয়ে দাঁড়ালাম। সীমান্তরক্ষী আমাদের কাগজপত্র দেখে বললেন, আপনারা পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছেন। তারপর আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে বললেন, স্বাগতম স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে। আবেগে আমার চোখে পানি এসে গেল। আমি সীমান্ত রক্ষীকে

জড়িয়ে ধরে বললাম, আপনাদের নয় মাস ত্যাগ ও তিতিক্ষার ফসল আজকের এই বাংলাদেশ, আপনাদের নিয়ে আমরা গর্ব করি ভাই। মেজ ভাইও তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

এভাবেই আমরা বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখলাম। সেকি প্রশান্তি, সেকি আনন্দ! অহঙ্কারে বুকটা ভরে গেল। মনে হচ্ছিল বাংলার প্রতিটি মানুষ যেন আমার কত আপন।

বাংলাদেশের সীমান্তে অনেক ভাড়ার গাড়ি ছিল। গাড়ির ড্রাইভাররাও এসে জিজ্ঞেস করতে লাগল, ভাই আপনারা কোথায় যাবেন? ট্যাক্সি নিয়ে ঢাকা যাওয়া যেত কিন্তু অদূরে দেখলাম অনেকেই মিডিয়াম সাইজের একটা খোলা ট্রাক ড্রাইভারের সাথে কথা বলছে। আমি কাছে এগিয়ে গেলাম। ট্রাক ড্রাইভার বলছে, দশ জন হলেই আমি যেতে পারি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভাই ঢাকা পর্যন্ত জনপ্রতি কত নিবেন ? ড্রাইভার বলল, ৫০ টাকা।

আমি রাজি হয়ে গেলাম। মেজ ভাই বলল, খোলা ট্রাকে কেন যাবি? তারপর আবার দাঁড়িয়ে যেতে হবে।

বাতাস খেতে খেতে স্বাধীন বাংলার মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে যাব আমি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বললাম।

১৮/১৯ ঘণ্টা ট্রাকে বসে আসলি, তাতেও তোর মন ভরেনি!

ওই কথা আর মনে করো না, প্লিজ! আমি বিরক্ত হয়ে বললাম।

অগত্যা মেজ ভাই রাজি হয়ে গেলেন। আমরা ১০ জন ট্রাকে উপরে উঠলাম, তার মধ্যে ক'জন আবার নিচে চাদর বিছিয়ে বসে পড়ল। আমি আর মেজ ভাই ট্রাকের এক প্রান্ত ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরেই ট্রাক ছেড়ে দিল। তখন দুপুর সাড়ে বারটা কি একটা বাজে। লক্কর ঝক্কর মিনি ট্রাক ছুটে চলল। বাতাসে আমাদের চুল উড়তে লাগল। চারিদিকে বাংলার সবুজ শ্যামলিমা খাল বিল নদী আর ছোট ছোট কুঁড়েঘর।

মাঝে মাঝে নজরে পড়ল পল্লিবধূ কাঁখে কলসি নিয়ে নদীর ঘাটে পানি নিতে যায়। কৃষক কাঁধে লাঙ্গল নিয়ে ক্ষেতের পানে যায়, রাখাল ছেলে গরু ছাগল চরিয়ে বেড়ায় আর গাছের ছায়ায় বসে বাঁশি বাজায়। এতদিন শুধু কবিতায় আর গল্পের বইতে পড়েছি। আজ সেই সব গল্প কবিতা জীবন্ত হয়ে আমার চোখের সামনে ধরা দিল। কি অপরূপ মনোরম সে দৃশ্য!

চোখে না দেখলে তো জীবনটাই অপূর্ণ থেকে যেত। আমি প্রাণ ভরে সব উপভোগ করছিলাম। মেজ ভাইকেও দেখলাম প্রাণ ভরে সব দেখছে আর উপভোগ করছে।

আমার মনের অজান্তেই হঠাৎ করে আবেগের বশবর্তী হয়ে গাইতে শুরু করলাম:

'ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা, ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি' ।

সার্থক গানের বাণী! এর চেয়ে সুন্দর উপমা আর কি হতে পারে! আমি বারে বারেই কণ্ঠ ছেড়ে গানটি গাইছিলাম। আর লক্ষ করছিলাম, আমার সাথের যাত্রী সোজা সরল নিরীহ বাঙালি ভাইয়েরা হাত তালি দিয়ে বলছে, ভাইজান আপনি তো অনেক সুন্দর গান করেন, আরেকটা গান না! আমি আবার ধরলাম, 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা'। এইভাবে লক্করঝক্কর মিনি ট্রাকের যাত্রীরা ঝাঁকি খেতে খেতে একটার পর একটা অনুরোধ করেই যাচ্ছে আর আমিও ঝাকি খেতে খেতে গেয়ে যাচ্ছি। একটুও বিরক্ত লাগছিল না আমার। কারণ আমি ভাবছিলাম, এই লোকগুলো ৯টি মাস যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে। আর আমি এদের এই সামান্য অনুরোধটুকু রাখব না! তা হতেই পারে না। ওদের আনন্দ দেখে আমারও অনেক আনন্দ লাগছিল। তাই আমি একটার পর একটা গেয়েই যাচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে ওদের কাছ থেকে যুদ্ধের সেই সব দুঃসাহসিক গল্প শুনছিলাম। এক পর্যায়ে আমিও ওদেরকে বলেছিলাম, আমরা দু'ভাই কি কষ্ট করে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছি। ওরা আমাদের কাহিনী শুনে শিহরিত হচ্ছিল এবং কথার ফাঁকে ফাঁকে বলছিল, আমরাও পাঞ্জাবিদের এমন মাইর দিছি যে তারা সারা জীবন মনে রাখবে।

আমার ভীষণ ভালো লাগছিল সবার কাছ থেকে টুকরো টুকরো যুদ্ধের বাস্তব গল্প শুনে। আমি মনে মনে ভাবছিলাম, আমি তখন দেশে থাকলে অবশ্যই মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতাম। এভাবেই চলতে চলতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। অনেকেই যশোর শহরে নেমে গেল, অনেকে ফরিদপুর নেমে গেল। চলতি পথে আরও ২/১ জন নেমে গেল। সবার শেষে আমাদের ঢাকা মহাখালীতে নামিয়ে দিল। আমরা বাবার কথামতো আমাদের চাচার বাসায় গিয়ে উঠলাম। সেখানে কিছুদিন থেকে আমরা আমাদের দেশের বাড়ি বরিশাল গৌরনদীতে গিয়ে পৌঁছলাম। পরে অবশ্য আমরা ঢাকা চলে এসেছিলাম যখন বাবা পাকিস্তান থেকে সবাইকে নিয়ে ঢাকা ফিরে এলেন।